একবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ ।
মহাসুরভিভির্ধূপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মৌক্তিকৈঃ**—মুক্তার দ্বারা; **কুসুম**—ফুলের; **স্রগ্‌ভিঃ**—মালার দ্বারা; **দুকূলৈঃ**—বস্ত্র; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **তোরণৈঃ**—তোরণের দ্বারা; **মহা-সুরভিভিঃ**—অত্যন্ত সুগন্ধিত; **ধূপৈঃ**—ধূপের দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—অলংকৃত; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—পৃথু মহারাজ যখন তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য মুক্তা, ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্র ও স্বর্ণ-তোরণের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শহরটিকে সাজানো হয়েছিল, এবং সারা নগরী সুগন্ধিত ধূপের দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সোনা, রূপা, মুক্তা, রত্ন, ফুল, বৃক্ষ, রেশমীবস্ত্র ইত্যাদি প্রকৃতিজাত উপহারের মাধ্যমে প্রকৃত ঐশ্বর্য সরবরাহ করা হয়। তাই বৈদিক সভ্যতায় ভগবানের দেওয়া এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপহারের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রকাশ ও অলংকৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার ঐশ্বর্য অচিরেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে এবং সমগ্র পরিবেশ চিন্ময় হয়ে ওঠে। পৃথু মহারাজের রাজধানী এই প্রকার অমূল্য ঐশ্বর্যময় অলংকারের দ্বারা সজ্জিত হয়েছিল।

শ্লোক ২

চন্দনাগুরুতোয়ার্দ্ররথ্যাচত্বরমার্গবৎ ।
পুষ্পাক্ষতফলৈস্তোক্মৈর্লাজৈরর্চির্ভিরর্চিতম্ ॥ ২ ॥

চন্দন—চন্দন; **অগুরু**—অগুরু নামক এক প্রকার সুগন্ধি গুল্ম; **তোয়**—জলের; **আর্দ্র**—সিক্ত; **রথ্যা**—রথ চলার পথ; **চত্বর**—প্রাঙ্গণ; **মার্গবৎ**—সংকীর্ণ পথ; **পুষ্প**—ফুল; **অক্ষত**—অখণ্ডিত; **ফলৈঃ**—ফলের দ্বারা; **তোক্মৈঃ**—খনিজ দ্রব্যের দ্বারা; **লাজৈঃ**—খই; **অর্চির্ভিঃ**—প্রদীপের দ্বারা; **অর্চিতম্**—সাজানো হয়েছিল।

অনুবাদ

নগরীর পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে সিক্ত হয়েছিল, এবং ফুল, ফল, খই, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, প্রদীপ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রীর দ্বারা সর্বত্র সাজান হয়েছিল।

শ্লোক ৩

সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্ ।
তরুপল্লবমালাভিঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

স-বৃন্দৈঃ—ফল ও ফুলসহ; **কদলী-স্তম্ভৈঃ**—কলাগাছের স্তম্ভের দ্বারা; **পূগ-পোতৈঃ**—সুপারি বৃক্ষের কচি ডালের দ্বারা; **পরিষ্কৃতম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত; **তরু**—নবীন বৃক্ষ; **পল্লব**—আম্রপল্লব; **মালাভিঃ**—মালার দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **সমলঙ্কৃতম্**—সুন্দরভাবে সজ্জিত।

অনুবাদ

পথের সন্ধিস্থলগুলি ফল, ফুল, কদলীস্তম্ভ, সুপারি গাছের ডাল, বৃক্ষ ও তরুপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল।

শ্লোক ৪

প্রজাস্তং দীপবলিভিঃ সম্ভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ ।
অভীয়ুর্মৃষ্টকন্যাশ্চ মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৪ ॥

প্রজাঃ—প্রজারা; **তম্**—তাকে; **দীপ-বলিভিঃ**—প্রদীপের দ্বারা; **সম্ভৃত**—সজ্জিত; **অশেষ**—অসংখ্য; **মঙ্গলৈঃ**—মাঙ্গলিক সামগ্রী; **অভীয়ুঃ**—তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এসেছিল; **মৃষ্ট**—সুন্দর অঙ্গকান্তি-সমন্বিতা; **কন্যাঃ চ**—এবং অবিবাহিত বালিকারা; **মৃষ্ট**—পরস্পর অঙ্গ সংলগ্ন; **কুণ্ডল**—কানের দুল; **মণ্ডিতাঃ**—অলংকৃত।

অনুবাদ

যখন রাজা নগরে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত নাগরিকেরা দীপ, পুষ্প, দধি ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নানা প্রকার রত্নালংকারে বিভূষিতা বহু সুন্দরী কুমারীও রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের পরস্পরের অঙ্গ সংলগ্ন হওয়ার ফলে, তাদের কানের দুল যেন পরস্পরকে স্পর্শ করছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় বর, রাজা, গুরু আদি বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য সুপারি, কলা, আঙ্গুর, ধান, দই, সিঁদুর ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়। তেমনই, অবিবাহিত কন্যারা, যারা বাইরে ও অন্তরে শুদ্ধ, তারা যখন সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে স্বাগত জানায়, তখন তাও শুভ বলে মনে করা হয়। কুমারী অর্থাৎ পুরুষের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়নি যে সমস্ত অবিবাহিত কন্যা, তারা সমাজের পবিত্র সদস্য। এখনও গোঁড়া হিন্দু সমাজের অবিবাহিত কন্যাদের অবাধে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না অথবা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিতামাতা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাদের রক্ষা করেন, বিবাহের পর তাদের পতিরা তাদের রক্ষা করেন, এবং বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের পুত্ররা তাদের রক্ষা করে। স্ত্রীলোকদের যখন এইভাবে রক্ষা করা হয়, তখন তারা সর্বদা পুরুষদের শক্তির মঙ্গলময় উৎস হয়।

শ্লোক ৫

শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চর্ত্বিজাম্ ।
বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতস্ময়ঃ ॥ ৫ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **ঘোষেণ**—শব্দের দ্বারা; **ব্রহ্ম**—বৈদিক; **ঘোষেণ**—মন্ত্র উচ্চারণ; **চ**—ও; **ঋত্বিজাম্**—পুরোহিতগণ; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ভবনম্**—প্রাসাদ; **বীরঃ**—রাজা; **স্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **গত-স্ময়ঃ**—নিরহঙ্কার।

অনুবাদ

রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল, পুরোহিতেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং স্তবকারীরা স্তব করলেন। কিন্তু তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান সত্ত্বেও, রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার।

তাৎপর্য

রাজাকে যে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ঐশ্বর্য-সমন্বিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গর্বিত হননি। তাই বলা হয় যে, শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যবান মহাপুরুষ কখনও গর্বিত হন না, এবং সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, ফলবান বৃক্ষ ঋজু না হয়ে, ফলের ভারে ঝুঁকে পড়ে, তেমনই গুণবান ব্যক্তি সর্বদাই বিনয়াবনত থাকেন। সেটিই হচ্ছে মহাপুরুষদের লক্ষণ।

শ্লোক ৬

পূজিতঃ পূজয়ামাস তত্র তত্র মহাযশাঃ ।
পৌরাঞ্জানপদাংস্তাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ ॥ ৬ ॥

পূজিতঃ—পূজিত হয়ে; **পূজয়াম্ আস**—পূজা নিবেদন করেছিল; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **মহা-যশাঃ**—মহাযশস্বী; **পৌরান্**—নগরের সম্মানিত মানুষেরা; **জান-পদান্**—সাধারণ প্রজারা; **তান্ তান্**—সেভাবে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রিয়-বর-প্রদঃ**—তাঁদের বর প্রদানে প্রস্তুত।

অনুবাদ

নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সাধারণ প্রজারা সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং রাজাও তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজার কাছে প্রজারা সব সময়ই সমীপবর্তী হতে পারে। সাধারণত মহান ও সাধারণ সমস্ত নাগরিকদেরই রাজাকে দর্শন করার ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার অভিলাষ থাকে। রাজা সেই কথা জানতেন, এবং তাই যখনই নাগরিকদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ করতেন অথবা তাদের

অভিযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এই প্রকার ব্যবহারে দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার থেকে অনেক ভাল, কারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজারা রাষ্ট্র-প্রধানদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে পারে না এবং তাদের অভিযোগ দূর করার জন্য কেউই দায়ী থাকে না। দায়িত্বশীল রাজতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রজাদের কোন অভিযোগ থাকত না, এবং থাকলেও তারা সরাসরিভাবে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে পারত, এবং রাজাও তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ৭

স এবমাদীন্যনবদ্যচেষ্টিতঃ
কর্মাণি ভূয়াংসি মহান্মহত্তমঃ ।
কুর্বন্ শশাসাবনিমণ্ডলং যশঃ
স্ফীতং নিধায়ারুরুহে পরং পদম্ ॥ ৭ ॥

সঃ—পৃথু মহারাজ; **এবম্**—এইভাবে; **আদীনি**—শুরু থেকেই; **অনবদ্য**—উদার; **চেষ্টিতঃ**—বিভিন্ন প্রকার কার্য করে; **কর্মাণি**—কর্ম; **ভূয়াংসি**—বারবার; **মহান্**—মহান; **মহৎ-তমঃ**—সব চাইতে মহান; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **অবনি-মণ্ডলম্**—পৃথিবী; **যশঃ**—খ্যাতি; **স্ফীতম্**—বিস্তৃত; **নিধায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **আরুরুহে**—উন্নীত হয়েছিলেন; **পরম্ পদম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ছিলেন মহত্তম মহাপুরুষ এবং তাই তিনি ছিলেন সকলেরই পূজ্য। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় বহু মহিমান্বিত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বদাই উদার। এই প্রকার মহান সাফল্য অর্জন করার ফলে, তাঁর খ্যাতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং চরমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজা বা কার্যাধ্যক্ষের প্রজাশাসনে বহু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য থাকে। রাজা বা সরকারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। রাজার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ [illegible] অনুসারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছে কিনা তা দেখা।

সমাজের বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে, যাতে সকলে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তা দেখাও রাজার কর্তব্য। আর তা ছাড়া, পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসারে, রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিকাশ সাধন করা।

বিভিন্ন স্তরের মহান ব্যক্তি রয়েছেন—মহান, মহত্তর ও মহত্তম—কিন্তু পৃথু মহারাজ তাঁদের সকলকে অতিক্রম করেছিলেন। তাই তাঁকে এখানে *মহত্তমঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথু মহারাজ ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং তিনি নিখুঁতভাবে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। তেমনই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেরাও তাদের কর্তব্য কর্ম সুচারুরূপে নির্বাহ করতে পারেন এবং তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, যাকে বলা হয় *পরং পদম্*। *পরং পদম্* বা বৈকুণ্ঠলোক কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পদকেও *পরং পদম্* বলা হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত না হলে, সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই *পরং পদম্* থেকে এই জড় জগতে আবার অধঃপতিত হতে হয়। তাই বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ*—নির্বিশেষবাদীরা *পরং পদ* লাভ করার জন্য কঠোর প্রয়াস করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত হওয়ার ফলে, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়। কেউ যদি অন্তরীক্ষে উড়তে পারে, তা হলে সে অনেক উঁচুতে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু সে যদি কোন গ্রহে পৌঁছাতে না পারে, তা হলে তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। তেমনই সেই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিরূপ *পরং পদম্* প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যেহেতু তারা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তাদের এই জড় জগতে কোন জড় গ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তারা যদি ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকও প্রাপ্ত হয়, তবুও তা এই জড় জগতেই অবস্থিত।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

তদাদিরাজস্য যশো বিজৃম্ভিতং
গুণৈরশেষৈর্গুণবৎসভাজিতম্ ।
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ সদস্পতে
কৌষারবিং প্রাহ গৃণন্তমর্চয়ন্ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **তৎ**—তা; **আদি-রাজস্য**—আদি রাজার; **যশঃ**—খ্যাতি; **বিজৃম্ভিতম্**—অত্যন্ত যোগ্য; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **অশেষৈঃ**—অন্তহীন; **গুণ-বৎ**—উপযুক্ত; **সভাজিতম্**—প্রশংসিত হয়ে; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **সদঃ-পতে**—মহর্ষিদের নায়ক; **কৌষারবিম্**—মৈত্রেয়কে; **প্রাহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **গৃণন্তম্**—কথা বলার সময়; **অর্চয়ন্**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ঋষিদের নায়ক শৌনক! অত্যন্ত যোগ্য মহিমান্বিত ও বিশ্ববিশ্রুত আদিরাজা পৃথুর সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, মহাভাগবত বিদুর অত্যন্ত বিনীতভাবে মৈত্রেয় ঋষির অর্চনা করে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বিদুর উবাচ

সোঽভিষিক্তঃ পৃথুর্বিপ্রৈর্লব্ধাশেষসুরার্হণঃ ।
বিভ্রৎ স বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বোর্যাভ্যাং দুদোহ গাম্ ॥ ৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—তিনি (মহারাজ পৃথু); **অভিষিক্তঃ**—যখন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **বিপ্রৈঃ**—মহর্ষি ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অশেষ**—অসংখ্য; **সুর-অর্হণঃ**—দেবতাদের উপহার; **বিভ্রৎ**—বিস্তার করে; **সঃ**—তিনি; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান বিষ্ণু থেকে প্রাপ্ত; **তেজঃ**—শক্তি; **বাহ্বোঃ**—বাহুদ্বয়; **যাভ্যাম্**—যার দ্বারা; **দুদোহ**—দোহন করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়! মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা যে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করেছিলেন, সমস্ত দেবতারা যে তাঁকে অসংখ্য উপহার প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যে বিষ্ণুতেজ প্রাপ্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে, আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন একজন মহান বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্ত। সেই জন্য সমস্ত দেবতারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা বিস্তারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর রাজ্যাভিষেকে মহান ঋষি ও সাধুরাও যোগদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য পৃথিবীর সম্পদ দোহন করেছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখব যে, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। রাষ্ট্রপ্রধান রাজা হোন অথবা রাষ্ট্রপতি হোন, এবং তাঁদের রাজ্য রাজতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক হোক, এই পন্থা এতই নিখুঁত যে, তা যদি অনুসরণ করা হয়, তা হলে সকলেই সুখী হবে এবং তার ফলে সকলের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা অত্যন্ত সহজ হবে।

শ্লোক ১০

কো ন্বস্য কীর্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো
যদ্বিক্রমোচ্ছিষ্টমশেষভূপাঃ ।
লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি কাম-
মদ্যাপি তন্মে বদ কর্ম শুদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

কঃ—কে; **নু**—কিন্তু; **অস্য**—মহারাজ পৃথু; **কীর্তিম্**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **ন শৃণোতি**—শ্রবণ করে না; **অভিজ্ঞঃ**—বুদ্ধিমান; **যৎ**—তাঁর; **বিক্রম**—বীরত্ব; **উচ্ছিষ্টম্**—উচ্ছিষ্ট; **অশেষ**—অসংখ্য; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **লোকাঃ**—গ্রহলোক; **স-পালাঃ**—তাদের দেবতাগণ সহ; **উপজীবন্তি**—জীবন যাপন; **কামম্**—বাঞ্ছিত বস্তু; **অদ্য অপি**—আজও; **তৎ**—তা; **মে**—আমাকে; **বদ**—দয়া করে বলুন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **শুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এতই মহান ছিল এবং তাঁর শাসন-প্রণালী এতই উদার ছিল যে, আজও সমস্ত রাজা ও বিভিন্ন গ্রহলোকের দেবতারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ

করেন। এমন কে আছে যে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করতে চাইবে না? আমি পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে আরও শুনতে চাই কারণ তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে মহাত্মা বিদুরের বারবার শ্রবণ করার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ রাজা ও রাষ্ট্র-প্রধানদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে তাঁরা জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তাঁদের রাজ্যশাসন করার উদ্দেশ্যে বারবার পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে কেউই পৃথু মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অথবা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আগ্রহী নয়; তাই পৃথিবীর কোন দেশই সুখী নয় অথবা পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে উন্নতশীল নয়, যদিও সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ

গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্ ।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **গঙ্গা**—গঙ্গানদী; **যমুনয়োঃ**—যমুনা-নদীর; **নদ্যোঃ**—দুটি নদীর; **অন্তরা**—মধ্যে; **ক্ষেত্রম্**—স্থান; **আবসন্**—বাস করে; **আরব্ধান্**—প্রারব্ধ; **এব**—সদৃশ; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **ভোগান্**—সৌভাগ্য; **পুণ্য**—পুণ্যকর্ম; **জিহাসয়া**—হ্রাস করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! পৃথু মহারাজ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডে বাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তাই মনে হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পূর্বকৃত পুণ্য ক্ষয় করার জন্য প্রারব্ধ সৌভাগ্য ভোগ করছেন।

তাৎপর্য

'পুণ্য' ও 'পাপ' কেবল সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মহারাজ পৃথু ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তিনি পুণ্য অথবা পাপ

কর্মের অধীন ছিলেন না। আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি যে, কোন জীব যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তাঁকে বলা হয় শক্ত্যাবেশ অবতার। পৃথু মহারাজ কেবল একজন শক্ত্যাবেশ অবতারই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তরা কর্মফলের অধীন নন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্যকর্মের ফল বিনষ্ট করে দেন। *আরব্ধান্ এব* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'যেন পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথু মহারাজের ক্ষেত্রে পূর্বকৃত কর্মফলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই এখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা অর্থে 'এব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*। অর্থাৎ, কখনও কখনও মানুষ ভগবানের অবতারকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অবতার অথবা তাঁর ভক্তরা এমনভাবে আচরণ করতে পারেন যে, মনে হয় যেন তাঁরা সাধারণ মানুষ, কিন্তু তা বলে কখনও তাঁদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। প্রামাণিক শাস্ত্রের উক্তি এবং আচার্যদের স্বীকৃতি ব্যতীত, সাধারণ মানুষদেরও কখনও ভগবানের অবতার বা ভক্ত বলে স্বীকার করা উচিত নয়। সনাতন গোস্বামী শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও নিজে তা প্রকাশ করেননি। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আচার্য অথবা গুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ১২

সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥ ১২ ॥

সর্বত্র—সব জায়গায়; **অস্খলিত**—অপ্রতিহত; **আদেশঃ**—আজ্ঞা; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্তদ্বীপ; **এক**—এক; **দণ্ড-ধৃক্**—দণ্ডধারী শাসনকর্তা; **অন্যত্র**—ব্যতীত; **ব্রাহ্মণ-কুলাৎ**—ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা; **অন্যত্র**—ব্যতীত; **অচ্যুত-গোত্রতঃ**—ভগবানের বংশধর (বৈষ্ণব)।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু ছিলেন সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর অপ্রতিহত আদেশ সাধু, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না।

তাৎপর্য

সপ্তদ্বীপ হচ্ছে (১) এশিয়া, (২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা, (৪) উত্তর আমেরিকা, (৫) দক্ষিণ আমেরিকা, (৬) অস্ট্রেলিয়া ও (৭) ওশিয়েনিয়া, এই সাতটি মহাদেশ। আধুনিক যুগে অনেকে মনে করে যে, বৈদিক যুগে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু সেই ধারণাটি সঠিক নয়। তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও হাজার-হাজার বছর পূর্বে পৃথু মহারাজ পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেছিলেন, এবং এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখনকার দিনে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে কেবল অবগতই ছিলেন না, সেই সমস্ত স্থান পৃথু মহারাজের মতো একজন রাজার দ্বারা শাসিত হত। যে দেশে পৃথু মহারাজ বাস করতেন, তা ছিল অবশ্যই ভারতবর্ষ, কারণ এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই স্থানটি ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ। ব্রহ্মাবর্ত নামক সেই স্থানটি হচ্ছে বর্তমান পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের রাজারা এক সময় সমগ্র পৃথিবী শাসন করতেন এবং তাঁরা ছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী।

অস্খলিত শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজের আদেশ পৃথিবীর কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। কিন্তু সেই আদেশ সাধু অথবা ভগবান বিষ্ণুর বংশধর বৈষ্ণবদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছিল না। ভগবান *অচ্যুত* নামে পরিচিত, এবং *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন সেই নামে তাঁকে সম্বোধন করেছেন (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*)। *অচ্যুত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনও প্রভাবিত না হওয়ার ফলে, যাঁর কখনও পতন হয় না। জীব যখন তার স্বরূপগত স্থিতি থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন সে *চ্যুত* হয়, অর্থাৎ অচ্যুতের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে বিস্মৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ বা সন্তান। জীব যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে, বিভিন্ন যোনির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, কিন্তু সে যখন পুনরায় তার স্বরূপগত চেতনায় ফিরে আসে, তখন আর সে জড় দেহের উপাধির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করে না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বলা হয়েছে *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*।

জড়-জাগতিক উপাধি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গোত্র জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভক্ত হন, তিনি তখন অচ্যুত-গোত্রধারী হন বা পরমেশ্বর ভগবানের বংশধর হন, এবং তার ফলে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত বিবেচনার অতীত হন।

পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ কুলের উপর, অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত জ্ঞানী পণ্ডিতদের উপর অথবা বৈষ্ণবদের উপর, যাঁরা হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের অতীত, তাঁদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেননি। তাই বলা হয়েছে—

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

"যে মনে করে যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কাঠ অথবা পাথরের তৈরি, যে সদ্‌গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, যে অচ্যুত-গোত্রভুক্ত বৈষ্ণবদের কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত অথবা যে ভগবানের চরণামৃত বা গঙ্গাজলকে সাধারণ জল বলে মনে করে, সে হচ্ছে একজন নারকী, অর্থাৎ সে নরকে বাস করছে।" *(পদ্মপুরাণ)*

এই শ্লোকে বর্ণিত তত্ত্ব থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের স্তরে না আসা পর্যন্ত মানুষকে রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন নন। ব্রাহ্মণ বলতে তাঁকে বোঝায়, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, বা পরম সত্যের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত, আর বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন।

শ্লোক ১৩

একদাসীন্মহাসত্রদীক্ষা তত্র দিবৌকসাম্ ।
সমাজো ব্রহ্মর্ষীণাং চ রাজর্ষীণাং চ সত্তম ॥ ১৩ ॥

একদা—এক সময়; **আসীৎ**—সংকল্প করেছিলেন; **মহা-সত্র**—মহাযজ্ঞ; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **তত্র**—সেই উৎসবে; **দিব-ওকসাম্**—দেবতাদের; **সমাজঃ**—সভা; **ব্রহ্ম-ঋষীণাম্**—ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিদের; **চ**—ও; **রাজ-ঋষীণাম্**—মহান ঋষিতুল্য রাজাদের; **চ**—ও; **সৎ-তম**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের।

অনুবাদ

এক সময় পৃথু মহারাজ এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, পৃথু মহারাজের বাসস্থল যদিও ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে, তবুও তাঁর মহান যজ্ঞে দেবতারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, পূর্বে দেবতারা এই গ্রহলোকে আসতেন। তেমনই, অর্জুন, যুধিষ্ঠির আদি মহাপুরুষেরা উচ্চতর লোকে যেতেন। এইভাবে উপযুক্ত বিমান ও অন্তরীক্ষ-যানের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকে যাতায়াতের প্রচলন ছিল।

শ্লোক ১৪

তস্মিন্নর্হৎসু সর্বেষু স্বর্চিতেষু যথার্হতঃ ।
উত্থিতঃ সদসো মধ্যে তারাণামুডুরাড়িব ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্—সেই মহাসভায়; **অর্হৎসু**—পূজনীয়দের; **সর্বেষু**—তাঁরা সকলে; **সু-অর্চিতেষু**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **যথা-অর্হতঃ**—যোগ্যতা অনুসারে; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সদসঃ**—সদস্যদের মধ্যে; **মধ্যে**—মধ্যে; **তারাণাম্**—তারাদের; **উডু-রাট্**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই মহান সভায় মহারাজ পৃথু সর্ব প্রথমে সমস্ত পূজনীয় অতিথিদের যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন, এবং তার পর তিনি সেই সভায় তারকা পরিবৃত চন্দ্রের মতো উত্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, পৃথু মহারাজের দ্বারা সেই মহাযজ্ঞে মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিথিকে স্বাগত জানানোর প্রথম বিধি হচ্ছে তাঁদের পদ ধৌত করা, এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিথিদের পাদপ্রক্ষালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তেমনই, পৃথু মহারাজও দেবতাদের, ঋষিদের, ব্রাহ্মণদের ও মহান রাজাদের যথাযথভাবে সংবর্ধনা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রাংশুঃ পীনায়তভুজো গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ ।
সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রাংশুঃ—অতি দীর্ঘ; **পীন-আয়ত**—পূর্ণ ও বিস্তৃত; **ভুজঃ**—বাহু; **গৌরঃ**—গৌরবর্ণ; **কঞ্জ**—পদ্মের মতো; **অরুণ-ঈক্ষণঃ**—প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল চক্ষু; **সু-নাসঃ**—সুন্দর নাসিকা; **সু-মুখঃ**—সুন্দর মুখমণ্ডল; **সৌম্যঃ**—সৌম্য; **পীন-অংসঃ**—উন্নত স্কন্ধ; **সু**—সুন্দর; **দ্বিজ**—দন্ত; **স্মিতঃ**—স্মিত হাস্য।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথুর দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ, তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ ও স্থূল, তাঁর নেত্রযুগল প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তাঁর নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব সৌম্য। তাঁর স্মিত হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে সুন্দর দন্তরাজি শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় পুরুষ ও রমণীরা সাধারণত অত্যন্ত সুন্দর হয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আমরা দেখতে পাব যে, পৃথু মহারাজের শারীরিক গঠন কেবল সুন্দরই ছিল না, তাঁর দেহ সমস্ত শুভ লক্ষণ-সমন্বিত ছিল।

বলা হয় যে, 'মুখ হচ্ছে মনের সূচক।' মানুষের মানসিক অবস্থা তার মুখের গঠনের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। মানুষের দেহের গঠনে তার পূর্বকৃত কর্মের প্রভাব প্রকাশ পায়। কারণ পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, মানুষ, পশু, দেবতা আদি সকলেরই পরবর্তী দেহ নির্ধারিত হয়। এটি আত্মার বিভিন্ন প্রকার দেহে দেহান্তরের প্রমাণ।

শ্লোক ১৬

ব্যূঢ়বক্ষা বৃহচ্ছ্রোণির্বলিবল্গুদলোদরঃ ।
আবর্তনাভিরোজস্বী কাঞ্চনোরুরুদগ্রপাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যূঢ়—প্রশস্ত; **বক্ষাঃ**—বক্ষ; **বৃহৎ-শ্রোণিঃ**—স্থূল কটিদেশ; **বলি**—রেখা; **বল্গু**—অত্যন্ত সুন্দর; **দল**—অশ্বত্থ পত্রের মতো; **উদরঃ**—উদর; **আবর্ত**—ঘূর্ণিস্রোত;

নাভিঃ—নাভি; **ওজস্বী**—উজ্জ্বল; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **উরুঃ**—উরুদ্বয়; **উদগ্র-পাৎ**—পায়ের পাতার উপরিভাগ উন্নত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের বক্ষস্থল বিস্তৃত, কটিদেশ স্থূল, উদর ত্রিবলী রেখায় সুশোভিত এবং অশ্বত্থ পত্রের মতো উর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোভাগে সংকুচিত। তাঁর নাভিদেশ আবর্তের মতো গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল, এবং পায়ের পাতার মধ্যভাগ উন্নত।

শ্লোক ১৭

সূক্ষ্মবক্রাসিতস্নিগ্ধমূর্ধজঃ কম্বুকন্ধরঃ ।
মহাধনে দুকূলাগ্র্যে পরিধায়োপবীয় চ ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম; **বক্র**—কুঞ্চিত; **অসিত**—কৃষ্ণবর্ণ; **স্নিগ্ধ**—চিক্কণ; **মূর্ধজঃ**—মাথার চুল; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **কন্ধরঃ**—গলদেশ; **মহা-ধনে**—অত্যন্ত মূল্যবান; **দুকূল-অগ্র্যে**—ধুতি পরিহিত; **পরিধায়**—দেহের উপরিভাগে; **উপবীয়**—উপবীতের মতো; **চ**—ও।

অনুবাদ

তাঁর কেশকলাপ—সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ; গলদেশ শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত। তিনি একটি অতি মূল্যবান ধুতি পরেছিলেন, এবং তাঁর দেহের উপরিভাগে ছিল এক অতি সুন্দর উত্তরীয়।

শ্লোক ১৮

ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীর্নিয়মে ন্যস্তভূষণঃ ।
কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃকৃতোচিতঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যঞ্জিত—ইঙ্গিত করে; **অশেষ**—অসংখ্য; **গাত্র**—দেহ; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **নিয়মে**—নিয়ন্ত্রিত; **ন্যস্ত**—পরিত্যক্ত; **ভূষণঃ**—বস্ত্র; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণবর্ণ; **অজিন**—চর্ম; **ধরঃ**—ধারণ করে; **শ্রীমান্**—সুন্দর; **কুশ-পাণিঃ**—কুশহস্তে; **কৃত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **উচিতঃ**—প্রয়োজন অনুসারে।

অনুবাদ

যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সময় পৃথু মহারাজ তাঁর মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিনি যখন কৃষ্ণাজিন পরিধান করেছিলেন এবং আঙ্গুলে কুশাঙ্গরীয় ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, কারণ তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূর্বে পৃথু মহারাজ সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শিশিরস্নিগ্ধতারাক্ষঃ সমৈক্ষত সমন্ততঃ ।
উচিবানিদমুর্বীশঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ১৯ ॥

শিশির—শিশির; **স্নিগ্ধ**—আর্দ্র; **তারা**—তারকা; **অক্ষঃ**—চক্ষু; **সমৈক্ষত**—দেখেছিলেন; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **উচিবান্**—বলতে শুরু করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **উর্বীশঃ**—অত্যন্ত সম্মানীয়; **সদঃ**—সভাসদদের মধ্যে; **সংহর্ষয়ন্**—তাঁদের আনন্দ বর্ধন করে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সভাস্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং তাঁদের আনন্দ বর্ধন করার জন্য পৃথু মহারাজ শিশির-স্নিগ্ধ তারকার মতো চক্ষুর দ্বারা তাঁদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন, এবং তার পর তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁদের বলেছিলেন।

শ্লোক ২০

চারু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মৃষ্টং গূঢ়মবিক্লবম্ ।
সর্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব ॥ ২০ ॥

চারু—সুন্দর; **চিত্র-পদম্**—বিচিত্র পদবিশিষ্ট; **শ্লক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত স্পষ্ট; **মৃষ্টম্**—মহান; **গূঢ়ম্**—গভীর অর্থযুক্ত; **অবিক্লবম্**—নিঃশঙ্ক; **সর্বেষাম্**—সকলের জন্য; **উপকার-অর্থম্**—উপকারের জন্য; **তদা**—তখন; **অনুবদন্**—বলতে লাগলেন; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের সেই বাণী ছিল অত্যন্ত মনোহর, বিচিত্র পদবিশিষ্ট, স্পষ্টভাবে বোধগম্য, শ্রবণ-মধুর, গম্ভীর ও শুদ্ধ। তিনি যেন উপস্থিত সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পৃথুর দেহসৌষ্ঠব অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এবং তাঁর বাণীও সর্বতোভাবে ওজস্বী ছিল। তাঁর বাণী আলঙ্কারিক পদবিশিষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ছিল, এবং তা কেবল সুন্দরই ছিল না, তা অত্যন্ত সহজবোধ্য ও স্পষ্ট ছিল।

শ্লোক ২১

রাজোবাচ

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥ ২১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বলতে শুরু করলেন; **সভ্যাঃ**—হে সভ্যগণ; **শৃণুত**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **বঃ**—আপনাদের; **সাধবঃ**—সমস্ত মহাত্মাগণ; **যে**—যিনি; **ইহ**—এখানে; **আগতাঃ**—উপস্থিত হয়েছেন; **সৎসু**—মহোদয়গণের প্রতি; **জিজ্ঞাসুভিঃ**—জানতে ইচ্ছুক; **ধর্মম্**—ধর্মীয় অনুশাসন; **আবেদ্যম্**—বক্তব্য; **স্ব-মনীষিতম্**—বিচারিত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—হে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আপনারা, সমস্ত মহাত্মারা, যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, দয়া করে আমার প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসু, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধবঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন অত্যন্ত মহান ও বিখ্যাত হন, তখন অনেক অসৎ ব্যক্তি তাঁর শত্রু হয়, কারণ ঈর্ষা করাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের স্বভাব। সভায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের সমাবেশ হয়, এবং তাই, পৃথু মহারাজ

যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত মহৎ, সেই সভায় হয়তো তাঁর কিছু শত্রু উপস্থিত ছিল, যারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেনি। পৃথু মহারাজ কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিদের কথাই বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই তিনি প্রথমে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা না করে, সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিদের সম্বোধন করেছিলেন। রাজারূপে তিনি সকলকে আদেশ করেননি, পক্ষান্তরে সেই সাধু ও মহর্ষিদের সভায় তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর একজন মহান রাজারূপে, তিনি তাঁদের আদেশ প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনীত, নম্র ও সৎ, তাই তিনি তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তাঁদের স্বীকৃতির জন্য তাঁদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। এই জড় জগতে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাদের চারটি ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু পৃথু মহারাজ যদিও সেই সমস্ত ত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন, তবুও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর বক্তব্য মহাত্মা, সাধু ও মুনি-ঋষিদের সমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্ ॥ ২২ ॥

অহম্—আমি; **দণ্ড-ধরঃ**—রাজদণ্ড-ধারণকারী; **রাজা**—রাজা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ইহ**—এই জগতে; **যোজিতঃ**—নিযুক্ত; **রক্ষিতা**—রক্ষক; **বৃত্তি-দঃ**—উপজীবিকা প্রদানকারী; **স্বেষু**—তাদের নিজেদের; **সেতুষু**—সামাজিক বর্ণবিভাগ; **স্থাপিতা**—স্থাপিত; **পৃথক্**—ভিন্ন-ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় আমি এই লোকের রাজারূপে নিযুক্ত হয়েছি, এবং প্রজাদের শাসনের জন্য, বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং বৈদিক নির্দেশে স্থাপিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে তাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আমি এই রাজদণ্ড ধারণ করেছি।

তাৎপর্য

কোন বিশেষ গ্রহলোকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভগবানের দ্বারা রাজা নিযুক্ত হয়ে থাকেন বলে মনে করা হয়। এখন যেমন আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে একজন করে রাষ্ট্রপতি রয়েছেন, ঠিক তেমনই প্রতিটি গ্রহলোকে একজন প্রধান ব্যক্তি রয়েছেন। কেউ যখন রাষ্ট্রপতি বা রাজা হন, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবান

তাঁকে সেই সুযোগটি দিয়েছেন। বৈদিক প্রথায় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং নাগরিকেরা তাঁকে নররূপী ভগবান বলে শ্রদ্ধা করেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, ভগবান সমস্ত জীবদের পালন করেন, বিশেষ করে মানুষদের, যাতে তারা সর্বোত্তম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। নিম্নতর যোনিতে বহু বহু জন্মের পর, জীব যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, বিশেষ করে সভ্য মানুষের জীবন, তখন সেই মনুষ্য-সমাজকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন *(চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* ইত্যাদি) । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক বিভাগ, এবং পৃথু মহারাজ ঘোষণা করেছেন যে, সেই সামাজিক বিভাগ অনুসারে প্রতিটি মানুষের যথাযথ উপজীবিকা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা বা সরকারের কর্তব্য হচ্ছে মানুষ যাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের নিজ-নিজ বৃত্তিতে যথাযথভাবে নিযুক্ত থাকে তা দেখা। বর্তমান সময়ে সরকার বা রাজা যেহেতু প্রজাদের এইভাবে সংরক্ষণ করছে না, তাই সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য অথবা কে শূদ্র তা কেউই জানে না, আর মানুষ কেবল তার জন্মসূত্রে কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করছে। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজের বর্ণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কারণ তার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতপক্ষে সুসংস্কৃত হতে পারবে। মানব-সমাজ যদি এই চারটি বর্ণবিভাগ অবলম্বন না করে, তা হলে মানব-সমাজ পশু-সমাজের থেকে কোন মতেই উন্নত হতে পারে না, যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকে না, কেবল থাকে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রজায়তে ইতি প্রজা । *প্রজা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই পৃথু মহারাজ তাঁর রাজ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সমস্ত প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। *প্রজা* শব্দে কেবল মানুষদেরই বোঝায় না, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি অন্য সমস্ত জীবদেরও বোঝায়। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবদের সুরক্ষা ও আহার প্রদান করা। আধুনিক সমাজের মূর্খ ও দুর্বৃত্তদের সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। পশুরা যে-স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও সেই রাজ্যের প্রজা, এবং তারাও ভগবানের কাছ থেকে বেঁচে থাকার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যাপকভাবে পশুহত্যার ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জন্য কসাই, তার দেশ ও তার সরকারকে ভবিষ্যতে তার ফলভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২৩

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্ ॥ ২৩ ॥

তস্য—তার; **মে**—আমার; **তৎ**—তা; **অনুষ্ঠানাৎ**—সম্পাদন করার দ্বারা; **যান্**—যা; **আহুঃ**—বলা হয়েছে; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বেদজ্ঞদের দ্বারা; **লোকাঃ**—গ্রহলোক-সমূহ; **স্যুঃ**—হয়; **কাম-সন্দোহাঃ**—ঈপ্সিত বস্তু প্রদানকারী; **যস্য**—যার; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হয়; **দিষ্ট-দৃক্**—নিয়তির দ্রষ্টা।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—আমি মনে করি যে, রাজারূপে আমি যদি আমার কর্তব্য সম্পাদন করি, তা হলে আমি বেদজ্ঞদের দ্বারা বর্ণিত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারব। সমস্ত নিয়তির দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, সেই গন্তব্যস্থল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ *ব্রহ্মবাদিনঃ* শব্দটির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। *ব্রহ্ম* শব্দে *বেদকে* বোঝায়, যাকে শব্দব্রহ্মও বলা হয়। এই শব্দব্রহ্ম কোন সাধারণ ভাষা নয়, যদিও তা সাধারণ ভাষায় লেখা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। বৈদিক শাস্ত্র-প্রমাণকে চরম প্রমাণ বলে স্বীকার করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে বহু তত্ত্ব রয়েছে, এবং তাতে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধেও বহু নির্দেশ রয়েছে। যে রাজা তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রাণীদের সুরক্ষা প্রদান করার দ্বারা তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন। তাও নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার উপর। এমন নয় যে, কেউ যদি যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন, তা হলেই তিনি আপনা থেকেই স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন। এই উন্নতি নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার উপর। অতএব চরমে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের ফলে, জীব তার বাঞ্ছিত কার্যকলাপের ফল লাভ করতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

জীবের নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পূর্ণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। *কাম-সন্দোহাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি'। সকলেই জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের বাসনা করে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, মানব-জীবনের কোন পরিকল্পনা নেই। এই মহামূর্খতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তার ফলে মানব-সভ্যতা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম জানে না, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। যেহেতু তারা এক-একটি মহা-নাস্তিক, তাই তারা ভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁর আদেশ বিশ্বাস করে না, এবং তাই তারা জানে না প্রকৃতি কিভাবে কার্য করে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সহ জনসাধারণের মহামূর্খতা জীবনকে এতই বিপজ্জনক করে তোলে যে, মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের জীবনের উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩০) অনুসারে তারা জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। *অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিশ্রম্* । কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও জনসাধারণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করতে শুরু করেছে। সকলেরই কর্তব্য এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা।

শ্লোক ২৪

য উদ্ধরেৎকরং রাজা প্রজা ধর্মেষশিক্ষয়ন্ ।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগং চ স্বং জহাতি সঃ ॥ ২৪ ॥

যঃ—যে রাজা বা রাজ্যপাল; **উদ্ধরেৎ**—আদায় করে; **করম্**—কর; **রাজা**—রাজা; **প্রজাঃ**—প্রজা; **ধর্মেষু**—তাদের কর্তব্য সম্পাদনে; **অশিক্ষয়ন্**—কিভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, সেই শিক্ষা না দিয়ে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **শমলম্**—পাপ; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **ভগম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—ও; **স্বম্**—নিজের; **জহাতি**—ত্যাগ করে; **সঃ**—সেই রাজা।

অনুবাদ

যে রাজা তাঁর প্রজাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার শিক্ষা না দিয়ে, কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, তাঁকে প্রজাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়, এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কর্তব্য সম্পাদন না করে রাজা, রাজ্যপাল অথবা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষা দেওয়া। রাজা যদি তাঁর সেই কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে কেবল করই গ্রহণ করেন, তা হলে যারা সেই সংগ্রহের শরিক, অর্থাৎ সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা—তাঁদের সকলকে জনসাধারণের পাপকর্মের ফলভোগ করতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কোন পাপময় স্থানে ভোজন করে, তা হলে তাকে সেখানে অনুষ্ঠিত পাপকর্মের ফলভোগ করতে হবে। (তাই বৈদিক সমাজে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজন করাবার জন্য গৃহে নিমন্ত্রণ করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তার পাপকর্মের ফল থেকে তাকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সর্বত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে যে অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রসাদ বিতরণ হয়, সেখানে অংশ গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।) বহু সূক্ষ্ম নিয়ম রয়েছে যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীর মানুষদের মঙ্গলের জন্য এই বৈদিক জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিতরণ করছে।

শ্লোক ২৫

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়বঃ ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ—অতএব; **প্রজাঃ**—হে প্রজাগণ; **ভর্তৃ**—প্রভুর; **পিণ্ড-অর্থম্**—পারলৌকিক কল্যাণ; **স্ব-অর্থম্**—নিজের হিত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনসূয়বঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে; **কুরুত**—সম্পাদন কর; **অধোক্ষজ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ধিয়ঃ**—তাঁর চিন্তা করে; **তর্হি**—অতএব; **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহ**—কৃপা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বলতে লাগলেন—অতএব হে প্রজাবৃন্দ! তোমাদের রাজার পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তোমাদের কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং সর্বদা তোমাদের হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা কর। তা করলে তোমাদের নিজেদের হিতসাধন হবে এবং তোমাদের রাজারও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করে তোমরা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ-ধিয়ঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এর অর্থ হচ্ছে 'কৃষ্ণভাবনামৃত'। রাজা ও প্রজা উভয়েরই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া উচিত, তা না হলে তারা উভয়েই মৃত্যুর পর নিম্নতর যোনি প্রাপ্ত হবে। দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তি বিনা রাষ্ট্র অথবা নাগরিক কেউই দায়িত্বশীল হতে পারে না। পৃথু মহারাজ তাই তাঁর নাগরিকদের কৃষ্ণভক্তি আচরণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, এবং কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হতে হয়, সেই সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দিতে তিনি নিজেও অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের সার কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) প্রদান করা হয়েছে—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু দান কর এবং যে তপস্যা অনুষ্ঠান কর, তা সবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর।" সরকারি কর্মচারী সহ রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষদের যদি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে যদিও প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা দণ্ডনীয়, তবুও তাদের আর সেই দণ্ডভোগ করতে হবে না।

শ্লোক ২৬

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োঽমলাঃ ।
কর্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎপ্রেত্য তৎফলম্ ॥ ২৬ ॥

যূয়ম্—এখানে উপস্থিত সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণ; **তৎ**—তা; **অনুমোদধ্বম্**—আমার প্রস্তাব দয়া করে অনুমোদন করুন; **পিতৃ**—পিতৃলোক থেকে যাঁরা এসেছেন; **দেব**—স্বর্গলোক থেকে যাঁরা এসেছেন; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অমলাঃ**—যাঁরা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **শাস্তুঃ**—আদেশ প্রদানকারী; **অনুজ্ঞাতুঃ**—সমর্থকদের; **তুল্যম্**—সমান; **যৎ**—যা; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **তৎ**—তা ; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

আমি সমস্ত নির্মল-হৃদয় দেবতা, পিতৃ ও ঋষিদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, কারণ মৃত্যুর পর কর্মের ফল কর্মকর্তা, আদেশকর্তা, ও সমর্থককে সমানভাবে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সরকার ছিল আদর্শ, কারণ তা ঠিক বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। পৃথু মহারাজ পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছেন যে, সকলেই যে তাঁদের নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হচ্ছেন, তা দেখা সরকারের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যে, মানুষ আপনা থেকেই কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হবে। পৃথু মহারাজ তাই চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রজারা যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কারণ তাঁরা যদি তা করেন, তা হলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সমান লাভের ভাগীদার হবেন। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হন, তা হলে তাঁর পন্থা অনুমোদন করার দ্বারা তাঁর যে-সমস্ত প্রজারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরাও স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন। যেহেতু বর্তমানে যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারিত হচ্ছে তা অকৃত্রিম, পূর্ণ ও প্রামাণিক, এবং তা পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তাই যাঁরা এই আন্দোলনে সহযোগিতা করছেন অথবা এই আন্দোলনের নীতি স্বীকার করেছেন, তাঁদেরও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী সেবকদের সমান ফল লাভ হবে।

শ্লোক ২৭

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

অস্তি—অবশ্যই রয়েছেন; **যজ্ঞ-পতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **নাম**—নামক; **কেষাঞ্চিৎ**—কারও মতে; **অর্হ-সৎ-তমাঃ**—হে পূজ্যতম; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অমুত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—ও; **লক্ষ্যন্তে**—দেখা যায়; **জ্যোৎস্না-বত্যঃ**—শক্তিমান, সুন্দর; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **ভুবঃ**—শরীর।

অনুবাদ

হে পূজ্যতমগণ! প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে, একজন পরম পুরুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন, যিনি আমাদের কর্মের ফল প্রদান করছেন। তা না হলে কেন এমন কোন কোন ব্যক্তিদের দেখা যায়, যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে অসাধারণ সৌন্দর্য ও শক্তিসম্পন্ন হন?

তাৎপর্য

রাজ্য শাসন করার সময় পৃথু মহারাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের ভগবৎ-চেতনার স্তরে উন্নীত করা। সেই যজ্ঞস্থলে যেহেতু বহু লোকের সমাগম হয়েছিল, তাই সেখানে নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকার মানুষ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজ কেবল তাঁদেরই সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, যাঁরা নাস্তিক ছিলেন না। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ নাগরিকদের *অধোক্ষজ-ধিয়ঃ* অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এই শ্লোকে তিনি বিশেষভাবে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করছেন। যদিও তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহা নাস্তিক, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ পালন করেননি এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তাঁরা কেবল তাঁকে সিংহাসনচ্যুতই করেননি, অভিশাপ দিয়ে হত্যাও করেছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলে তারা মনে করে যে, দৈনন্দিন জীবনে সব কিছুই ঘটছে জড়-জাগতিক আয়োজনের ফলে অথবা ঘটনাক্রমে। নাস্তিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন বিশ্বাস করে, যাতে মনে করা হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয়ের ফলে সব কিছু ঘটছে। তারা কেবল জড় পদার্থকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে প্রাণের উদ্ভব হয়, এবং তা হচ্ছে পুরুষ বা ভোক্তা; তার পর, জড় পদার্থ ও জীবনী-শক্তির সমন্বয়ের ফলে বিবিধ প্রকার সৃষ্টির উদ্ভব হয়। নাস্তিকেরা *বেদের* বাণীও বিশ্বাস করে না। তাদের মতে বৈদিক নির্দেশগুলি কেবল কতকগুলি মতবাদ মাত্র এবং জীবনে সেগুলির কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, পৃথু মহারাজ প্রস্তাব করেছিলেন যে, উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বিনা নানা প্রকার সৃষ্টি সম্ভব নয়, ভগবৎ-বিশ্বাসী মানুষেরা যেন সেই কথা বিচার করে নাস্তিকদের মতবাদ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করেন। নাস্তিকেরা কোন রকম প্রমাণ ছাড়াই দাবি করে যে, ঘটনাক্রমে কেবল বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু আস্তিকেরা বেদের নির্দেশ বিশ্বাস করার ফলে, বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতেই কেবল তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এঁদের সকলেরই কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিধিনিষেধ রয়েছে, সেই সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। বর্তমান সময়ে তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা যদিও তাদের প্রকৃত সংস্কৃতি

হারিয়ে ফেলেছে, তবুও তারা জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়ার দাবি করে। এই সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার জন্য সেই কথা তারা স্বীকার করতে চায় না। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত ভয়ংকর মায়াবাদ দর্শন, যেই মতবাদে ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, তা বেদবিহিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, মায়াবাদীরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সব চাইতে গর্হিত অপরাধী। বৈদিক প্রথায় যারা *বেদের* নির্দেশ মানে না, তাদের বলা হয় নাস্তিক। বুদ্ধদেব যখন অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁকে সেই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য *বেদকে* অস্বীকার করতে হয়েছিল, এবং সেই জন্য *বেদের* অনুগামীদের মতে তিনি হচ্ছেন নাস্তিক। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বৌদ্ধ-দর্শনের অনুগামীরা যেহেতু *বেদের* প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাই তারা হচ্ছে নাস্তিক, কিন্তু শঙ্করাচার্য ছলনাপূর্বক *বেদকে* প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধদের মায়াবাদ-দর্শন অনুসরণ করেছিলেন, তাই মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের অনুগামীদের বৌদ্ধদের থেকেও অধিক ভয়ংকর বলে বিবেচনা করেছেন। শঙ্করবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর যে রূপ তা কেবল কল্পনাপ্রসূত। এই মতবাদ ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধদের থেকেও অধিক ভয়ংকর। নাস্তিক ও মায়াবাদীদের এই সমস্ত দার্শনিক মতবাদ সত্ত্বেও, কৃষ্ণভক্তরা নিষ্ঠাসহকারে *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ পালন করেন, যা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার। *ভগবদগীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"যিনি সমস্ত জীবের উৎস ও সর্বব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীয় কর্তব্যকর্মের দ্বারা আরাধনা করার ফলে, সিদ্ধিলাভ করা যায়।" তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, যে-কথা *বেদান্ত-সূত্রে* বর্ণনা করা হয়েছে *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)* । ভগবান নিজেও *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —"আমিই সব কিছুর উৎস।" পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস, এবং সেই সঙ্গে পরমাত্মারূপে তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে পরিব্যাপ্ত। তাই পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা *(স্ব-কর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য)* সেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। পৃথু মহারাজ সেই সূত্রটি তাঁর প্রজাদের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

মানব-সভ্যতার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করার চেষ্টা করা।

সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—স্বধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অর্জুন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাঁর স্বধর্ম ছিল যুদ্ধ করা, এবং তাঁর সেই ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সকলেরই কর্তব্য এই নীতি অনুসরণ করা। যে-সমস্ত নাস্তিকেরা তা করে না, তাদের ভর্ৎসনা করে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) বলা হয়েছে—*তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্* । এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তারা অত্যন্ত ক্রূর ও নরাধম। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই প্রকার দুষ্কৃতকারীরা জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তারা অসুর বা নাস্তিকরূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম-জন্মান্তরে এই প্রকার অসুরেরা ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে, অবশেষে বাঘ, সিংহ আদি হিংস্র পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে, কোটি-কোটি বছর ধরে তারা কৃষ্ণ-জ্ঞানবিহীন হয়ে অন্ধকারে অবস্থান করে।

পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় পুরুষোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি অন্য সমস্ত জীবের মতোই একজন পুরুষ, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সমস্ত পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা নায়ক। *বেদেও* সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । সমস্ত নিত্যের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য, সমস্ত চেতনের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম চেতন, এবং তিনি পূর্ণ। অন্য জীবের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন তাঁর হয় না, কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালক তাই তাদেরকে সঠিক স্তরে নিয়ে আসার অধিকার তাঁর রয়েছে, যাতে তারা সুখী হতে পারে। পিতা যেমন চান যে, তাঁর পরিচালনায় থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানেরা সুখী হোক, তেমনই পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও চান যে, সমস্ত জীবেরাই সুখী হোক। এই জড় জগতে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পিতা ও পুত্র উভয়েই নিত্য, কিন্তু জীব যদি তার নিত্য আনন্দময় ও জ্ঞানময় জীবনের স্তরে না আসে, তা হলে তার সুখী হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পুরুষোত্তম ভগবানের যদিও সাধারণ জীবদের থেকে লাভ করার মতো কিছুই নেই, তবুও তাঁদের ভালমন্দ বিচার করার অধিকার তাঁর রয়েছে। সঠিক উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কার্যকলাপের পন্থা, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি *(স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্)* । জীব তার স্বধর্মে নিযুক্ত হতে পারে, কিন্তু সে যদি তার সেই স্বধর্মে সিদ্ধিলাভ করতে চায়,

তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। যাঁরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেন, তাঁরা জীবনের উন্নততর সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, কিন্তু যারা তাকে অসন্তুষ্ট করে, তারা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েন।

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, দুই প্রকার কর্ম রয়েছে—বৈষয়িক কর্ম ও যজ্ঞের জন্য কর্ম *(যজ্ঞার্থাৎ কর্ম)*। যে কর্ম যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না তা বন্ধনের কারণ। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে সেই কর্ম আমাদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/৯) এই কর্মবন্ধন প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত হয়। জড় অস্তিত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত বাধা-বিপত্তিগুলি জয় করার জন্য এক প্রকার সংগ্রাম। অসুরেরা সমস্ত বাধাবিপত্তি জয় করার জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করছে, এবং জড়া প্রকৃতির মোহময়ী শক্তির প্রভাবে মূর্খ জীবেরা এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে এবং সেটিকে সুখ বলে মনে করে। তাকে বলা হয় মায়া। সেই কঠোর জীবন সংগ্রামে তারা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

জীবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভগবান আমাদের নিয়মাবলী প্রদান করেছেন, ঠিক যেমন রাজা তাঁর রাজ্যে আইন প্রদান করেন, এবং কেউ যখন সেই আইন ভঙ্গ করে, তখন তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। তেমনই, ভগবান আমাদের *বেদের* অচ্যুত জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—মানুষের এই চারটি ত্রুটির দ্বারা কলুষিত নয়। আমরা যদি *বেদের* নির্দেশ না মেনে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কর্ম করি, তা হলে ভগবানের আইনে আমাদের অবশ্যই দণ্ডভোগ করতে হবে, এবং তিনি জীবকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রদান করেন। জড় অস্তিত্ব বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের পন্থা প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার শরীর অনুসারে হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপের স্তরবিভাগ অবশ্যই রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যিনি সম্পূর্ণরূপে পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছেন (সম্পূর্ণরূপে পুণ্যকর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে কেবল তা সম্ভব), তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।" ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার এই জীবনকে বলা হয় *অধোক্ষজ-*

ধিয়ঃ, অথবা কৃষ্ণভক্তির জীবন। পৃথু মহারাজ চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রজারা যেন সেই পন্থা অনুসরণ করে।

বিভিন্ন প্রকারের জীবন ও জড় সৃষ্টি ঘটনাক্রমে বা আবশ্যকতার ফলে উদ্ভব হয় না; সেগুলি হচ্ছে জীবনের পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম অনুসারে ভগবানের বিবিধ আয়োজন। পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে, কেউ ভাল দেশে ভাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে, এবং সে সুন্দর দেহ, উচ্চশিক্ষা অথবা প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করতে পারে। তাই, আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার জীবনের মান রয়েছে, এবং দৈহিক গঠন ও শিক্ষার স্তর, ইত্যাদি পরমেশ্বর ভগবান পুণ্য অথবা পাপকর্মের ফল অনুসারে প্রদান করেন। তাই বিভিন্ন প্রকার জীবন ঘটনাক্রমে বিকশিত হয় না। পক্ষান্তরে তা নির্ধারিত হয় পূর্বকৃত ব্যবস্থা অনুসারে। ভগবানের এই পরিকল্পনা *বেদে* বর্ণিত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সেই জ্ঞানের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে চরমে, বিশেষ করে মনুষ্য-শরীর লাভ করে, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের দ্বারা সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার মতবাদটি বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, *অজ্ঞাত-সুকৃতি* কথাটির মাধ্যমে সব চাইতে ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। *অজ্ঞাত-সুকৃতি* কথাটির অর্থ হচ্ছে অজ্ঞাতসারে কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করা। কিন্তু তাও পরিকল্পিত। যেমন, কৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো আসেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে একজন ভক্ত হিসাবে আসেন, অথবা তিনি তাঁর প্রতিনিধি গুরুদেবকে প্রেরণ করেন, অথবা শুদ্ধ ভক্তকে প্রেরণ করেন। সেটিও পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারেই সংঘটিত হয়। তাঁরা আসেন প্রচার করার জন্য এবং শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তার ফলে ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন জীব তাঁদের সঙ্গ করার, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়, এবং কোন না কোনভাবে যদি বদ্ধ জীব এই প্রকার ব্যক্তিদের শরণাগত হয়ে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করে, তা হলে সে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার সুযোগ পায় এবং জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) *সর্ব-পাপেভ্যঃ* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে'। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত, গুরুদেব অথবা ভগবানের অন্যান্য প্রামাণিক অবতারদের সঙ্গলাভ করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেন। তখন তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৮-২৯

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥ ২৮ ॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥ ২৯ ॥

মনোঃ—মনু (স্বায়ম্ভুব মনু); **উত্তানপাদস্য**—ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তানপাদের; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **মহী-পতেঃ**—মহান রাজার; **প্রিয়ব্রতস্য**—ধ্রুব মহারাজের পরিবারভুক্ত প্রিয়ব্রতের; **রাজর্ষেঃ**—মহান রাজর্ষির; **অঙ্গস্য**—অঙ্গ নামক; **অস্মৎ**—আমার; **পিতুঃ**—আমার পিতা; **পিতুঃ**—পিতার; **ঈদৃশানাম্**—এই প্রকার মহাপুরুষদের; **অথ**—ও; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **অজস্য**—পরম অমরের; **চ**—ও; **ভবস্য**—জীবদের; **চ**—ও; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কৃত্যম্**—তাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে; **অস্তি**—আছে; **গদা-ভৃতা**—গদাধারী পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তা কেবল বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়নি, মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের দ্বারা এবং প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি প্রমুখ মহাজনদের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন গদাধারী পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, সাধুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং সদ্গুরুর পরিচালনায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে প্রকৃত মার্গ নির্ধারণ করতে হয় *(সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য)* । সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া বৈদিক নির্দেশ পালন করেন। যিনি বৈদিক নির্দেশের প্রামাণিক ভিত্তি অনুসারে এবং

মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসারে যথাযথ পন্থা প্রদর্শন করেন, তাঁকে বলা হয় গুরু। জীবন-গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, স্বায়ম্ভুব মনু প্রমুখ যে-সমস্ত মহাজনদের উল্লেখ পৃথু মহারাজ এখানে করেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এই প্রকার মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সব চাইতে নিরাপদ পন্থা, বিশেষ করে যাঁদের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে। মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, নারদ মুনি, মনু, কুমার, প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ, যমরাজ, ভীষ্ম, জনক, শুকদেব গোস্বামী ও কপিল মুনি।

শ্লোক ৩০

দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্ ।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥ ৩০ ॥

দৌহিত্র-আদীন্—আমার পিতা বেণ আদি পৌত্রগণ; **ঋতে**—বিনা; **মৃত্যোঃ**—মূর্তিমান মৃত্যুর; **শোচ্যান্**—নিন্দনীয়; **ধর্ম-বিমোহিতান্**—ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হয়ে; **বর্গ**—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **অপবর্গাণাম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **এক**—এক; **আত্ম্য**—পরমেশ্বর ভগবান; **হেতুনা**—কারণ।

অনুবাদ

আমার পিতা এবং মূর্তিমান মৃত্যুর পৌত্র বেণ প্রমুখ নিন্দনীয় ব্যক্তিরা ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হলেও, পূর্বোল্লিখিত মহাপুরুষেরা স্বীকার করেছেন যে, এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা স্বর্গলোকে উন্নতির আশীর্বাদ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই প্রদান করতে পারেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের পিতা রাজা বেণ ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন এবং বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন একজন নাস্তিক, যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেননি, এবং যিনি তাঁর রাজ্যে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ রাজা বেণের চরিত্র নিন্দনীয় বলে মনে করেছিলেন, কারণ বেণ ধর্ম অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মূর্খ ছিলেন। নাস্তিকেরা মনে করে যে, ধর্ম আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও

মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, ধর্ম হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থায় শান্তি স্থাপনের জন্য মানুষকে নীতিপরায়ণ ও সৎ হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য এক মনগড়া ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা। অধিকন্তু, তারা বলে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যে ভগবানকে স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন নেই, কারণ কেউ যদি নীতিপরায়ণ ও সততার আদর্শ অনুসরণ করে, তা হলেই যথেষ্ট। তেমনই, কেউ যদি অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য খুব ভালভাবে পরিকল্পনা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে, তা হলে আপনা থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন হবে। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে না, কারণ কেউ যদি যে-কোন উপায়েই হোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে, তা হলে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে। আর মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মৃত্যুর পরে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। পৃথু মহারাজ কিন্তু তাঁর পিতা, যে ছিল মূর্তিমান মৃত্যুর দৌহিত্র, তার এই প্রকার নাস্তিক মতবাদ স্বীকার করেননি। সাধারণত কন্যা পিতার গুণ অর্জন করে এবং পুত্র মাতার গুণাবলী অর্জন করে। তাই মৃত্যুর কন্যা সুনীথা তার পিতার গুণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং বেণ তার মাতার গুণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল। যারা সংসার চক্রে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা জড়-জাগতিক ধারণার অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। যেহেতু রাজা বেণ ছিলেন সেই প্রকার ব্যক্তি, তাই তিনি ভগবানের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারেননি। আধুনিক সভ্যতা রাজা বেণের মতবাদ স্বীকার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করি, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন।

কেউ যদি ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যাপারে ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে, তা হলে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, একই নৈতিক স্তরের দুই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ফল কেন প্রাপ্ত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তি সমান নৈতিকতা, সততা ও আচার-পরায়ণ হলেও তাদের পদ তবু সমান নয়। তেমনই, অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, দুজন মানুষ দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করলেও সমান ফল প্রাপ্ত হয় না। কেউ হয়তো বিনা পরিশ্রমেই প্রভূত ঐশ্বর্য উপভোগ করে, আর অন্য কেউ কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও দিনে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপারেও, কারও যথেষ্ট খাবার থাকলেও তবুও তার পারিবারিক জীবনে সে সুখী নয় অথবা কখনও কখনও সে বিবাহিত পর্যন্ত নয়,

কিন্তু এক ব্যক্তি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন স্বচ্ছল না হলেও, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচুর সুযোগ তার রয়েছে, এমন কি শূকর, কুকুর প্রভৃতি পশুদেরও মানুষদের থেকে অধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সুযোগ রয়েছে। মুক্তি ব্যতীত, ধর্ম, অর্থ, ও কাম—জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির কথা যদি আমরা বিবেচনা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, সেগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, কেউ একজন রয়েছেন, যিনি এই বিভিন্ন স্তরগুলি নির্ধারণ করছেন। চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল মুক্তির জন্যই ভগবানের উপর নির্ভর করতে হবে তা নয়, জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলির জন্যও ভগবানের উপর নির্ভর করতে হয়। পৃথু মহারাজ তাই ইঙ্গিত করেছেন যে, ধনী পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ সুখী হয় না। তেমনই, মূল্যবান ওষুধ ও সুদক্ষ চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু হয়; অথবা নিরাপদে বড় নৌকায় থাকা সত্ত্বেও মানুষ জলে ডুবে মারা যায়। এইভাবে আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত বাধা-বিপত্তিগুলি প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হবে না।

শ্লোক ৩১

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৩১ ॥

যৎ-পাদ—যাঁর চরণকমল; **সেবা**—সেবা; **অভিরুচিঃ**—রুচি; **তপস্বিনাম্**—তপস্বীদের; **অশেষ**—অসংখ্য; **জন্ম**—জন্ম; **উপচিতম্**—গ্রহণ করে; **মলম্**—মল; **ধিয়ঃ**—মন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **ক্ষিণোতি**—ধ্বংস করে; **অন্বহম্**—প্রতিদিন; **এধতী**—বৃদ্ধি করে; **সতী**—হয়ে; **যথা**—যেমন; **পদ-অঙ্গুষ্ঠ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি; **বিনিঃসৃতা**—বিনির্গত; **সরিৎ**—জল।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অভিরুচির ফলে, দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষ অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের মতো এই পন্থা তৎক্ষণাৎ মনকে নির্মল করে, এবং তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, যাঁরা নিয়মিত গঙ্গা স্নান করেন, তাঁরা প্রায় সব রকম রোগ থেকে মুক্ত থাকেন। কলকাতার একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্রাহ্মণ কখনও ডাক্তারের ওষুধ খেতেন না। কখনও যদি তাঁর অসুখ হত, তা হলে তিনি ওষুধ না খেয়ে কেবল গঙ্গাজল পান করতেন, এবং তার ফলে অতি শীঘ্র তাঁর রোগ নিরাময় হত। গঙ্গার মহিমা সমস্ত ভারতবাসীরা অবগত। গঙ্গানদী কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও কখনও গঙ্গার জলে মল ও নিকটবর্তী কলকারখানা থেকে পরিত্যক্ত অন্যান্য সমস্ত ময়লা দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করেন, এবং তাঁরা শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সুস্থ এবং পারমার্থিক দিক দিয়েও অত্যন্ত উন্নত। সেটিই হচ্ছে গঙ্গার জলের প্রভাব। গঙ্গার এই মাহাত্ম্যের কারণ হচ্ছে যে, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। তেমনই, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা গ্রহণ করেন অথবা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমরা দেখেছি যে, পূর্বে যাঁদের জীবন অত্যন্ত কলুষিত ছিল, কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করার ফলে, তাঁরা তাঁদের সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন এবং অতি দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি লাভ করছেন। পৃথু মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত তথাকথিত নৈতিকতা, অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। তাই ভগবানের সেবা করা বা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত, এবং তার ফলে অচিরেই একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হওয়া যায়, এবং সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি* । একজন দায়িত্বশীল রাজা হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, কেবল তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শরণাগত আত্মার সমস্ত পাপের ফল তৎক্ষণাৎ দূর করে দেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, ভগবানের কৃপার মূর্ত-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবও শিষ্যের দীক্ষার সময়, শিষ্যের পাপপূর্ণ জীবনের সমস্ত কর্মফল গ্রহণ করেন। এইভাবে শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি পবিত্র থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা কলুষিত হন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেন। কখনও কখনও গুরুদেব তাঁর শিষ্যের পাপের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে স্বয়ং এক প্রকার কষ্টভোগ করেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অধিক শিষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

শ্লোক ৩২

বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্যবান্ ।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্
ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

বিনির্ধুত—বিশেষরূপে ধৌত হয়ে; **অশেষ**—অন্তহীন; **মনঃ-মলঃ**—মনোধর্মের কলুষ; **পুমান্**—পুরুষ; **অসঙ্গ**—বিরক্ত হয়ে; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞানসম্মতভাবে; **বিশেষ**—বিশেষরূপে; **বীর্যবান্**—ভক্তিযোগের বলে বলীয়ান হয়ে; **যৎ**—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্ম; **মূলে**—মূলে; **কৃত-কেতনঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—কখনই না; **সংসৃতিম্**—সংসার; **ক্লেশ-বহাম্**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ; **প্রপদ্যতে**—গ্রহণ করে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা অথবা মনোধর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে বীর্যবান হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব হয়। একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমূলের আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই ভক্তকে আর কখনও ত্রিতাপ দুঃখ-সমন্বিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন যে, ভগবানের পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন, অথবা ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা চিত্ত ধীরে ধীরে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অনাদিকাল ধরে জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবে, আমাদের চিত্তে

স্তূপীকৃত আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছে। তার পূর্ণ প্রভাব তখনই দেখা যায়, যখন জীব তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর এই দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে জন্মমৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। কেউ যখন ভক্তিযোগের বলে বলীয়ান হয়, তখন তার মন এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়, এবং তখন আর তার এই সংসারের প্রতি অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না।

ভক্তির লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞান ও বৈরাগ্য। জীব যে তার স্বরূপে তার শরীর নয়, সেটিই হচ্ছে জ্ঞান, এবং বৈরাগ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অনীহা। ভক্তিযোগের বলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এই দুটি মৌলিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইভাবে ভক্ত যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় স্থির হন, তখন তাঁর দেহত্যাগের পর, এই জড় জগতে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* ।

এই শ্লোকে *বিজ্ঞান* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীব যখন তার দেহকে আর তার স্বরূপ বলে মনে করে না, তখন চিন্ময় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। *ভগবদ্গীতায়* সেই জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *ব্রহ্মভূত* বা চিন্ময় উপলব্ধির বিকাশ। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব চিন্ময় উপলব্ধি লাভ করতে পারে না, কারণ সে তখন জড়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিচয় অনুভব করে। জড় জগৎ ও চিৎ জগতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাকে বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞানের স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে আসার পর, জীব ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়। সেই স্তরে সে পূর্ণরূপে তার নিজের স্থিতি ও পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই উপলব্ধিকে এখানে *বিজ্ঞান-বিশেষ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হন, তখন তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানকে *প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যম্*, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা ধর্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ তার পারমার্থিক জীবনের উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি অন্যান্য পন্থার অনুশীলনের দ্বারা নিজের উন্নতির বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না, কিন্তু ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে নিজের পারমার্থিক উপলব্ধি দর্শন করা যায়, ঠিক যেমন আহার করলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তৃপ্তি অনুভব করা যায়। রজ ও তমোগুণের প্রভাবে জীব ভ্রান্তভাবে

এই জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায় এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু ভক্তিযোগের প্রভাবে এই দুটি প্রবণতার ক্ষয় হয় এবং জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণ অতিক্রম করে জীব শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়, যা জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে জীবের আর কোন সন্দেহ থাকে না। সে বুঝতে পারে যে, তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না।

শ্লোক ৩৩

তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্মভিঃ
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যূয়ম্**—তোমরা, সমস্ত প্রজারা; **ভজতঃ**—আরাধনা করে; **আত্ম**—নিজের; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **কায়**—দেহ; **গুণৈঃ**—বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা; **স্ব-কর্মভিঃ**—বৃত্তিগত কর্মের দ্বারা; **অমায়িনঃ**—নিষ্কপটে; **কাম-দুঘ**—সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করে; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **যথা**—যতদূর সম্ভব; **অধিকার**—যোগ্যতা; **অবসিত-অর্থ**—সম্পূর্ণরূপে নিজের হিত সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে; **সিদ্ধয়ঃ**—তৃপ্তি।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন—তোমাদের কায়মনোবাক্য এবং তোমাদের বৃত্তিগত কর্মের ফল অর্পণ করার দ্বারা সর্বদা উদার চিত্তে ভগবানের সেবা কর। তোমাদের যোগ্যতা ও বৃত্তি অনুসারে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, নিষ্কপটে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত হও। তা হলে তোমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধনে তোমরা সফল হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্ব-কর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য*—নিজের বৃত্তিগত কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হবে। সেই জন্য চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের পদ্ধতি স্বীকার করা আবশ্যক। পৃথু মহারাজ তাই বলেছেন,

গুণৈঃ স্ব-কর্মভিঃ । এই পদাংশটির ব্যাখ্যা *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"জড়া প্রকৃতির গুণ এবং সেই সমস্ত গুণে সম্পাদিত বিশিষ্ট কর্তব্যকর্ম অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান এই চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সৃষ্টি করেছেন।" সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত যে-ব্যক্তি, তিনি নিশ্চিতভাবে অন্যদের থেকে অধিকতর বুদ্ধিমান। তাই তিনি সত্য ভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযম, মনোসংযম, শুচিতা, সহিষ্ণুতা, আত্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব—এই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ অনুশীলন করতে পারেন। এইভাবে কেউ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করতে পারেন। তেমনই ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, দান করা, নিষ্ঠা সহকারে রাজকার্যে বৈদিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করতে নির্ভীক থাকা। ক্ষত্রিয় এইভাবে তাঁর বৃত্তিগত কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন। তেমনই, বৈশ্য তাঁর বৃত্তি সম্পাদনের দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, গো রক্ষা করে এবং যখন অতিরিক্ত কৃষি উৎপাদন হয়, তখন প্রয়োজন হলে বিনিময় করে ব্যবসা করার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন। তেমনই, শূদ্রেরা যেহেতু যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের উচ্চবর্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, তার বাণীকে সর্বদা ভগবানের প্রার্থনা নিবেদনে অথবা ভগবানের মহিমা প্রচারে যুক্ত করা, এবং তার দেহকে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভগবানের সেবা সম্পাদনে যুক্ত করা। আমাদের শরীরে যেমন মস্তক, বাহু, উদর ও পা—এই চারটি অঙ্গ রয়েছে, তেমনই, মানব-সমাজরূপী শরীরকেও গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান মানুষদের মস্তকের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, ক্ষত্রিয়দের বাহুর কার্য সম্পাদন করতে হয়, বৈশ্যদের উদরের কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং শূদ্রদের পায়ের কার্য সম্পাদন করতে হয়। জীবনের এই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কেউই উচ্চ নয় অথবা নীচ নয়; বর্ণবিভাগে উচ্চ ও নীচ বিচার রয়েছে, কিন্তু যেহেতু সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এক—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা—তাই তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান যেহেতু ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদেরও পূজ্য, তা হলে এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কিভাবে তাঁর সেবা করবে? সেই কথা পৃথু মহারাজ *যথাধিকার,* 'নিজের যোগ্যতা অনুসারে' শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন,

তা হলেই যথেষ্ট হবে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা রামানুজাচার্যের মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই, যাঁদের ক্ষমতা নিশ্চিতভাবেই আমাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। কোনও শূদ্র পর্যন্ত, যে প্রকৃতির গুণ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতম স্তরে অধিষ্ঠিত, সেই একই সাফল্য লাভ করতে পারে। নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করে, যে-কোন ব্যক্তি সার্থক হতে পারেন। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সরল ও উদার হওয়া অবশ্য কর্তব্য *(অমায়িনঃ)*। ভগবদ্ভক্তিতে সাফল্য লাভের জন্য জীবনের নিম্নস্তরে স্থিত হওয়া কোন অযোগ্যতা নয়। তিনি ব্রাহ্মণ হোন, ক্ষত্রিয় হোন, বৈশ্য হোন অথবা শূদ্রই হোন না কেন, তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সরলতা, উদারতা ও নিষ্কপটতা। তখন, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা তিনি জীবনের চরম সাফল্য লাভ করতে পারেন। ভগবান নিজেই যে-কথা প্রতিপন্ন করেছেন, *স্ত্রীয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্* (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩২)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা পতিতা স্ত্রী, তিনি যাই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা কার্য করার মাধ্যমে নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে এখানে *কামদুঘাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার সমস্ত শক্তি তাঁর রয়েছে। ভগবদ্ভক্ত এই জীবনেও সুখী, কারণ তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক অভাবগুলি পূর্ণ হয়, এবং চরমে তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩৪

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
র্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩৪ ॥

অসৌ—পরমেশ্বর ভগবান; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অনেক**—বিবিধ; **গুণঃ**—গুণাবলী; **অগুণঃ**—দিব্য; **অধ্বরঃ**—যজ্ঞ; **পৃথক্-বিধ**—বিবিধ প্রকার; **দ্রব্য**—ভৌতিক তত্ত্ব; **গুণ**—উপাদান; **ক্রিয়া**—অনুষ্ঠান; **উক্তিভিঃ**—বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা;

সম্পদ্যতে—পূজিত হন; **অর্থ**—স্বার্থ; **আশয়**—উদ্দেশ্য; **লিঙ্গ**—রূপ; **নামভিঃ**—নাম; **বিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞান; **ঘনঃ**—ঘনীভূত; **স্ব-রূপতঃ**—তাঁর স্বরূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তিনি জড় জগতের দ্বারা কলুষিত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন জড় বৈচিত্র্যবিহীন ঘনীভূত আত্মা, তবুও তিনি বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সংকল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের জন্য স্বীকার করেন।

তাৎপর্য

জাগতিক উন্নতি লাভের জন্য *বেদে* বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের নির্দেশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মা মানুষ, দেবতা আদি সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের জাগতিক বাসনা অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছেন *(সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা)* । এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলা হয়, কারণ তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক লাভ প্রাপ্ত হওয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে যেহেতু তার লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, তাই *বেদে* এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে কর্মকাণ্ড বা জাগতিক কার্যকলাপ, এবং সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা কলুষিত। সাধারণত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হয় রজোগুণে, তবুও বদ্ধ জীবেরা, মানুষ ও দেবতা উভয়েরই এই সমস্ত যজ্ঞ করা কর্তব্য, কারণ তা না হলে তারা মোটেই সুখী হতে পারবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি কলুষিত হলেও তাতে কিছু না কিছু ভগবদ্ভক্তি থাকে, কারণ যখনই কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, তখন তার কেন্দ্রে থাকেন বিষ্ণু। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্বল্প প্রচেষ্টাও ভক্তি এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান। ভক্তির লেশমাত্রও অনুষ্ঠাতার জড় প্রবৃত্তি শুদ্ধ করে এবং ধীরে ধীরে তা চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার যজ্ঞ জড়-জাগতিক কার্য হলেও তার ফল চিন্ময়। সূর্যযজ্ঞ, ইন্দ্রযজ্ঞ, চন্দ্রযজ্ঞ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতাদের নামে অনুষ্ঠিত হলেও, সেই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অংশ। এই সমস্ত দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য নিজেরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা তা গ্রহণ করেন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য, ঠিক যেমন কর সংগ্রাহক তাঁর নিজের জন্য কর

সংগ্রহ করতে পারেন না, তিনি তা সংগ্রহ করেন সরকারের জন্য। যে-কোন যজ্ঞ যখন এইভাবে পূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধি-সহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে *ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মার্পণম্* অথবা ভগবানে অর্পিত যজ্ঞ বলা হয়েছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ যজ্ঞফল ভোগ করতে পারেন না, তাই ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা *(ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্)*। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/২৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

"যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন, কারণ তিনি ব্রহ্মরূপ ক্রিয়াপরায়ণ, যাতে ব্রহ্মই হচ্ছেন অগ্নিরূপী গতি এবং অর্পিত হবিও ব্রহ্মসম।" যজ্ঞকর্তাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, *বেদে* যে-সমস্ত যজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য। *বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ (বিষ্ণুপুরাণ* ৩/৮/৯)। পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যা কিছু করা হয়, তা জড় হোক অথবা চিন্ময় হোক, বাস্তবিকপক্ষে তাকে যজ্ঞ বলে মনে করতে হবে, এবং এইভাবে যজ্ঞ করার ফলে, ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়। ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যক্ষ পন্থা হচ্ছে নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

এই নবধা ভক্তিকে এই শ্লোকে *বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনঃ,* অর্থাৎ, ভগবান বিষ্ণুর রূপে দিব্যজ্ঞান কেন্দ্রীভূত করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু যিনি সরাসরিভাবে এই পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁর উচিত পরোক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় যজ্ঞপতি। *শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ (শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৯/১৫)।

পরমেশ্বর ভগবানের গভীর বিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনীভূত। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ভাসাভাসা-ভাবে কিছু জানে, কিন্তু চিকিৎসকেরা সঠিকভাবে জানে না শরীরের সব কিছু হচ্ছে কিভাবে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সব কিছুই বিস্তারিতভাবে জানেন। তাই তাঁর জ্ঞান হচ্ছে *বিজ্ঞান-ঘন,* কারণ তাতে জড় বিজ্ঞানের মতো কোন ত্রুটি নেই।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘন;* তাই, যদিও তিনি জড় কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তাই পরমেশ্বর ভগবানের *অনেক-গুণ* বলতে তাঁর বহু দিব্য গুণাবলীকে বোঝানো হয়, কারণ তিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। বিভিন্ন প্রকার জড় সামগ্রী বা ভৌতিক উপাদান ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পর্যবসিত হয়, কারণ চরমে জড় ও চেতন গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সব কিছুই পরম চেতন পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উপলব্ধি ও শুদ্ধতার ক্রমোন্নতির ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ, যিনি জড়-জাগতিক লাভের জন্য বনে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু চরমে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করেছিলেন এবং তখন আর জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। *আশয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সংকল্প'। সাধারণত যে-কোন বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক লাভের সংকল্প থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত জড়-জাগতিক লাভের বাসনাগুলি যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে তৃপ্ত হয়ে যায়, তখন তিনি ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তর লাভ করেন। তখন তাঁর জীবন সার্থক হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

মানুষ অকাম (ভক্ত), সর্বকাম (কর্মী) অথবা মোক্ষকাম (জ্ঞানী বা যোগী) যাই হোক না কেন, সকলকেই ভক্তিযোগের প্রত্যক্ষ পন্থার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এইভাবে জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার লাভই একসঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৫

প্রধানকালাশয়ধর্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্ ।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্‌গুণাত্মকঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রধান—জড়া প্রকৃতি; **কাল**—কাল; **আশয়**—বাসনা; **ধর্ম**—বৃত্তিগত ধর্ম; **সংগ্রহে**—সমষ্টি; **শরীরে**—দেহ; **এষঃ**—এই; **প্রতিপদ্য**—স্বীকার করে; **চেতনাম্**—চেতনা;

ক্রিয়া—কার্যকলাপ; **ফলত্বেন**—ফলের দ্বারা; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভাব্যতে**—প্রকাশিত; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **তৎ-গুণ-আত্মকঃ**—আকৃতি ও গুণ অনুসারে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু জড়া প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও বৃত্তিগত ধর্মের সমন্বয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শরীরেও তিনি প্রকাশিত। একই অগ্নি যেমন বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাষ্ঠখণ্ডে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই বিভিন্ন প্রকার চেতনার বিকাশ হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবের সঙ্গে পরমাত্মারূপে নিরন্তর বিরাজ করেন। প্রতিটি জীব প্রকৃতি প্রদত্ত জড় শরীর অনুসারে সচেতন। জড় উপাদানগুলি কালের প্রভাবে সক্রিয় হয়, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির তিন গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীব এক বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। পশুজীবনে তমোগুণের প্রভাব এতই প্রবল যে, তাদের পক্ষে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, যদিও তিনি পশুদের হৃদয়েও বিরাজমান; কিন্তু মনুষ্য-শরীরে চেতনা উন্নত হওয়ার ফলে, মানুষ তার কার্যকলাপের প্রভাবে *(ক্রিয়া-ফলত্বেন)* তম ও রজোগুণ অতিক্রম করে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে। মানুষকে তাই উন্নত স্তরের সাধুর সঙ্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *বেদে (মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/১২)* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*— জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অথবা প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। *গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*— এটি একটি অবশ্য কর্তব্য; তাতে ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অবকাশ নেই। গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তাঁর সঙ্গ প্রভাবে জীবের ভগবৎ-চেতনা বিকশিত হতে থাকে। এই প্রকার চেতনার বিকাশের সর্বোচ্চ পূর্ণতার স্তরকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। প্রকৃতি যে-রকম শরীর প্রদান করে, সেই অনুসারে চেতনা প্রকাশ পায়, এবং যেভাবে চেতনা বিকশিত হতে থাকে, সেই অনুসারে জীব কার্য করে, এবং সেই কার্যের শুদ্ধতা অনুসারে প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এখানে যে-দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। অগ্নি সর্বদাই এক, কিন্তু ইন্ধনের আয়তন অনুসারে অগ্নি সোজা, বাঁকা, ছোট, বড়, ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়।

চেতনার বিকাশ অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। তাই, যারা মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার তপস্যা (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগ পদ্ধতি একটি সিঁড়ির মতো, সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার জন্য বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, এবং সেই ধাপ অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ অথবা ভক্তিযোগের স্তরে অবস্থিত। ভক্তিযোগ অবশ্য ভগবৎ উপলব্ধির সিঁড়ির সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ, চেতনার বিকাশ অনুসারে জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তাঁর সেই স্বরূপ উপলব্ধি যখন পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন তিনি অন্তহীন ব্রহ্মানন্দে অধিষ্ঠিত হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার সব চাইতে সহজ ও সরল পন্থা। এই পন্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত। পরমেশ্বর ভগবানের পরম উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (*ভগবদ্গীতা* ৪/১১)। শরণাগতির মাত্রা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। পূর্ণ সমর্পণ তখনই হয়, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হন। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)।

শ্লোক ৩৬

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্ ।
স্বধর্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষোণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অহো—তোমরা সকলে; **মম**—আমাকে; **অমী**—তারা সকলে; **বিতরন্তি**—বিতরণ করে; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গুরুম্**—পরম গুরু; **যজ্ঞ-ভুজাম্**—যজ্ঞভাগ গ্রহণের যোগ্য সমস্ত দেবতাগণ; **অধীশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **স্ব-ধর্ম**—বৃত্তিগত ধর্ম; **যোগেন**—দ্বারা; **যজন্তি**—পূজা করে; **মামকাঃ**—আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; **নিরন্তরম্**—নিরন্তর; **ক্ষোণি-তলে**—ভূপৃষ্ঠে; **দৃঢ়-ব্রতাঃ**—দৃঢ় সংকল্প সমন্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞফলের ঈশ্বর এবং ভোক্তা। তিনি পরম গুরুও। এই ভূমণ্ডলে সমস্ত প্রজারা যাঁরা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাঁরা স্বধর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন, তাঁরা আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদান করছেন। অতএব, হে প্রজাগণ! আপনাদের ধন্যবাদ।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার জন্য প্রজাদের প্রতি পৃথু মহারাজের উপদেশ এখানে দুইরূপে সমাপ্ত হয়েছে। যারা নবীন ভক্ত তাদের তিনি বার বার বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে তিনি সেই ভক্তদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে পরম গুরু ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত। এখানে বিশেষভাবে গুরুম্ শব্দটির উল্লেখ চৈত্য গুরুরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করে। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি সর্বদাই জীবকে তাঁর শরণাগত হয়ে প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন; তাই তিনি হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি অন্তরে ও বাইরে গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করে উভয়ভাবে বদ্ধ জীবদের সাহায্য করেন। তাই এখানে তাঁকে গুরুম্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষ ছিলেন তাঁর প্রজা। তাঁদের অধিকাংশই, প্রায় সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁদের ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকার ফলে, এবং এইভাবে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য, তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পক্ষান্তরে, যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা ও রাষ্ট্রপ্রধান পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেন এবং তার ফলে উভয়েই লাভবান হন।

শ্লোক ৩৭

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্ দ্বিজানাম্ ॥ ৩৭ ॥

মা—কখনও কর না; **জাতু**—কোন সময়; **তেজঃ**—পরম শক্তি; **প্রভবেৎ**—প্রদর্শন করে; **মহা**—মহান; **ঋদ্ধিভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **তপসা**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **চ**—ও; **দেদীপ্যমানে**—যাঁরা ইতিমধ্যেই মহিমান্বিত; **অজিত-দেবতানাম্**—বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত; **কুলে**—সমাজে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **রাজ-কুলাৎ**—রাজ-পরিবার থেকেও শ্রেষ্ঠ; **দ্বিজানাম্**—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁদের সহিষ্ণুতা, তপস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যার বলে মহিমান্বিত হন। এই সমস্ত দিব্য সম্পদের প্রভাবে বৈষ্ণবেরা রাজকুল থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজকুল যেন কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর তাদের বিক্রম প্রদর্শন না করে এবং কখনও তাঁদের চরণে অপরাধ না করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে রাজা ও প্রজা উভয়েরই জন্য পৃথু মহারাজ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেছেন। এখন তিনি বিশ্লেষণ করছেন কিভাবে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিকে একটি লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লতার কাণ্ড কোমল এবং তাই বর্ধিত হওয়ার জন্য তার একটি বৃক্ষের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, এবং বর্ধিত হওয়ার সময় যথেষ্ট সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। এই সুরক্ষার কথা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন। কেউ যদি বৈষ্ণব অপরাধ করে, তা হলে ভগবদ্ভক্তিতে তার প্রগতি প্রতিহত হয়। ভক্তিমার্গে অত্যন্ত উন্নত হলেও, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তার সমস্ত উন্নতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, একজন অতি মহান যোগী দুর্বাসা মুনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন, এবং সেই অপরাধ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁকে পুরো এক বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল, এমন কি তাঁকে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি যখন বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের কাছে যান, তখন ভগবানও তাঁকে রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। অতএব বৈষ্ণব চরণে অপরাধ সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। সব চাইতে গর্হিত বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে *গুর্বপরাধ,* বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ। দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে এই *গুর্বপরাধ* সব চাইতে গর্হিত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। *গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনম্ (পদ্মপুরাণ)*। দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে

সবচাইতে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা এবং বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সরল ভাষায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন—যাঁর দর্শন মাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হয়, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। এই শ্লোকে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণব হচ্ছেন তত্ত্ববেত্তা ব্রাহ্মণ এবং তাই তাঁকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অথবা বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ বলা হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ শুদ্ধ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন। কেউ যখন তাঁর শুদ্ধ পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, *ব্রহ্ম জানাতি,* তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ স্তরে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি প্রধানত নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব স্তর ব্রাহ্মণ স্তরেরও উর্ধ্বে। জড়-জাগতিক ধারণা অনুসারে, মানব-সমাজে ব্রাহ্মণের স্তর সর্বোচ্চ, কিন্তু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও উর্ধ্বে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়েই পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত। ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—সত্য, শৌচ, মনের সাম্য, ইন্দ্রিয় সংযম, সহিষ্ণুতা, সরলতা, তত্ত্বজ্ঞান, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস, এবং নিজের জীবনে ব্যবহারিকভাবে এই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রয়োগ। এই সমস্ত গুণের অতিরিক্ত, কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব হন। পৃথু মহারাজ তাঁর ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ প্রজাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না করেন। তাঁদের চরণে অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, সেই অপরাধের ফলে শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্ভূত যাদবেরা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ কখনও সহ্য করতে পারেন না। কখনও কখনও রাজপুরুষেরা অথবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা তাদের ক্ষমতার গর্বে উদ্ধত হয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপেক্ষা করে, তারা জানে না যে, তাদের সেই অপরাধের ফলে তাদের সর্বনাশ হবে।

শ্লোক ৩৮

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎপবিত্রং চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মণ্য-দেবঃ—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভু; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাতনঃ**—সর্বপ্রাচীন; **নিত্যম্**—নিত্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যাঁর; **চরণ**—চরণ-কমল; **অভিবন্দনাৎ**—পূজার দ্বারা; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **লক্ষ্মীম্**—ঐশ্বর্য; **অনপায়িনীম্**—নিরন্তর; **যশঃ**—খ্যাতি; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **চ**—ও; **মহৎ**—মহান; **তম**—পরম; **অগ্রণীঃ**—অগ্রগণ্য।

অনুবাদ

পুরাতন, শাশ্বত ও সমস্ত মহা-পুরুষদের অগ্রণী পরমেশ্বর ভগবান ভুবন-পাবন যশরূপী ঐশ্বর্য লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *ব্রহ্মণ্যদেব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মণ্য* বলতে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বোঝায়, এবং *দেব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূজনীয় ভগবান'। সুতরাং, বৈষ্ণব অথবা সত্ত্বগুণের (ব্রাহ্মণরূপে) সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। তম ও রজোগুণের নিম্ন অবস্থায় ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা বা অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ভগবানকে এখানে ব্রহ্মণ্য ও বৈষ্ণব সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

(*বিষ্ণুপুরাণ* ১/১৯/৬৫)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের প্রধান রক্ষক। তা না জেনে এবং তার সম্মান না করে, ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত কোনও কল্যাণকর কার্য বা মানবতাবাদী প্রচার সফল হতে পারে না। ভগবান হচ্ছেন পুরুষ বা পরম ভোক্তা। এমন নয় যে, তিনি যখন অবতার রূপে প্রকট হন তখনই তিনি কেবল ভোক্তা, পক্ষান্তরে তিনি অনাদি কাল ধরে ভোক্তা, অর্থাৎ শুরু থেকে *(পুরাতনঃ)* এবং নিত্যকাল ধরে *(নিত্যম্)* তিনি ভোক্তা। *যচ্চরণাভিবন্দনাৎ*—পৃথু মহারাজ বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান কেবল ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, নিত্য যশরূপ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবানকে জাগতিক লাভের জন্য কিছুই করতে হয় না। যেহেতু তিনি পরম পূর্ণ, তাই তাঁর কোন কিছুর আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে তিনি ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন। এগুলি তাঁর দৃষ্টান্তসূচক কার্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। সুদামা বিপ্র যখন তাঁর গৃহে এসেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পা ধুয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের শয্যায় তাঁকে বসতে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে ও কুন্তীদেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ভগবানের এই আদর্শ আচরণ আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাঁর এই ব্যক্তিগত আচরণ থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হবে, কিভাবে গাভীদের রক্ষা করতে হয়, কিভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় এবং কিভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা করতে হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/২১) ভগবান বলেছেন, *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*—"নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করেন, অন্যেরা আপনা থেকে তা অনুসরণ করে।" পরমেশ্বর ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কে হতে পারেন, এবং কার আচরণ অধিক আদর্শময় হতে পারে? এমন নয় যে, জড়-জাগতিক লাভের জন্য তাঁকে এগুলি করতে হয়েছিল। তিনি এইভাবে আচরণ করেছিলেন, কারণ জড় জগতে কিভাবে আচরণ করা উচিত, কেবল আমাদের সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *মহত্তম-অগ্রণীঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগতে *মহত্তম* বা মহান ব্যক্তিরা হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিব, কিন্তু ভগবান তাঁদেরও ঊর্ধ্বে। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর বীর্য, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বৈরাগ্য ও তাঁর যশ সবই *জগৎ-পবিত্রম্* অর্থাৎ জগৎ-পবিত্রকারী। তাঁর ঐশ্বর্য আমরা যতই আলোচনা করি, এই জগৎ ততই পবিত্র হয়। জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষদের যে ঐশ্বর্য তা কখনই স্থির নয়—এই জগতে লক্ষ্মী চঞ্চলা। আজকে যে অত্যন্ত ধনী, কাল সে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে; আজ যে অত্যন্ত বিখ্যাত, কাল সে কুখ্যাত হতে পারে। জড় জগতের যে ঐশ্বর্য তা কখনই স্থির নয়, কিন্তু এই ছয়টি ঐশ্বর্য পরমেশ্বর ভগবানে পূর্ণরূপে রয়েছে, কেবল চিৎ-জগতেই নয়, এই জড় জগতেও। তাঁর খ্যাতি এখনও অক্ষুণ্ণ, তাঁর দেওয়া জ্ঞান *ভগবদ্‌গীতা* আজও সকলের দ্বারা সম্মানিত। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছুই শাশ্বত।

শ্লোক ৩৯

যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ ।
তদেব তদ্ধর্মপরৈর্বিনীতৈঃ
সর্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যাঁর; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **অশেষ**—অন্তহীন; **গুহা-আশয়ঃ**—সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে; **স্ব-রাট্**—কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **বিপ্র-প্রিয়ঃ**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন; **কামম্**—বাসনার; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-ধর্ম-পরৈঃ**—ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **বিনীতৈঃ**—বিনম্রতার দ্বারা; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধর; **নিষেব্যতাম্**—সর্বদা তাঁদের সেবায় যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে বিরাজ করা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং নিষ্কপটে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধরদের সেবা করেন, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভগবান যখন দেখেন যে, কেউ তাঁর ভক্তের সেবা করছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি পূর্ণ, তাই তাঁর কারও সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থে সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করা উচিত। এই সেবা ভগবানকে সরাসরিভাবে করা যায় না, তা করতে হয় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মাধ্যমে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা,* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা না করলে, এই জড় বন্ধনের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। এই প্রকার আচরণ কেবল শাস্ত্রেই উল্লেখ করা হয়নি, আচার্যেরাও তা অনুসরণ করেন। ভগবানের আদর্শ আচরণ অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবায় যুক্ত হতে পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৪০

পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥ ৪০ ॥

পুমান্—পুরুষ; **লভেত**—লাভ করতে পারে; **অনতি-বেলম্**—অবিলম্বে; **আত্মনঃ**—তার আত্মার; **প্রসীদতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **অত্যন্ত**—অত্যধিক; **শমম্**—শান্তি; **স্বতঃ**—আপনা থেকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যৎ**—যাঁর; **নিত্য**—নিয়মিত; **সম্বন্ধ**—সম্বন্ধ; **নিষেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ততঃ**—তারপর; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **কিম্**—কি; **অত্র**—এখানে; **অস্তি**—আছে; **মুখম্**—সুখ; **হবিঃ**—ঘৃত; **ভুজাম্**—যাঁরা পান করেন।

অনুবাদ

নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারা হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করে পরম শান্তি লাভ করা যায় এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায়। এই জগতে ব্রাহ্মণদের সেবা করার থেকে শ্রেষ্ঠ সকাম কর্ম নেই, কারণ যে-সমস্ত দেবতাদের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই দেবতারা তার ফলে প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৬৫) বলা হয়েছে—*প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে* । আত্মতৃপ্ত না হলে, জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তাই পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন—

তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

"জন্মজন্মান্তর আমি ভক্তসমাজে বাস করে, আচার্যদের চরণসেবা করতে চাই।" কেবলমাত্র ভক্তসমাজে বাস এবং আচার্যদের আদেশ পালন করার দ্বারাই আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কলিযুগে, বর্তমান সময়ে, ব্রাহ্মণকুলের সেবা করা অত্যন্ত দুষ্কর। *বরাহ-পুরাণে* বলা হয়েছে, কলিযুগের সুযোগ নিয়ে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। *রাক্ষসাঃ*

কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু (বরাহ-পুরাণ)। অর্থাৎ, কলিযুগে তথাকথিত বহু জাতি-ব্রাহ্মণ ও জাতি-গোস্বামী রয়েছে, যারা শাস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দাবি করে যে, ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব হচ্ছে জন্মগত অধিকার। এই প্রকার কপট ব্রাহ্মণকুলের সেবা করে কোন লাভ হবে না। তাই সদ্‌গুরু ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গ করা এবং তাঁদের সেবা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তা নবীন ভক্তকে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। *ভগবদ্গীতার* (২/৪১) *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* শ্লোকটি ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, ভক্তিযোগের বিধি-বিধানগুলি বাস্তবিকই পালন করে অচিরেই মুক্তির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে-কথা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে *(অত্যন্তশমম্)।*

অনতিবেলম্ ('অবিলম্বে') শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কেবল ব্রাহ্মণদের ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কোন প্রয়োজন নেই। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি স্বয়ং। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, কিন্তু তিনি মহান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি কেবল মুক্তিই লাভ করেননি, সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম গুরুরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাই বৈদিক পন্থায় যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর, ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবার প্রথা রয়েছে।

শ্লোক ৪১

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্যগুঃ ॥ ৪১ ॥

অশ্নাতি—আহার করে; **অনন্তঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **খলু**—তা সত্ত্বেও; **তত্ত্ব-কোবিদৈঃ**—পরম সত্য সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **হুতম্**—অগ্নিতে আহুতি; **যৎ-মুখে**—যার মুখে; **ইজ্য-নামভিঃ**—বিভিন্ন দেবতাদের নামে; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তথা**—তেমনই; **চেতনয়া**—জীবনী-শক্তির দ্বারা; **বহিঃ-**

কৃতে—বঞ্চিত হয়ে; **হুত-অশনে**—যজ্ঞাগ্নিতে; **পারমহংস্য**—ভক্তদের সম্বন্ধে; **পর্যগুঃ**—কখনও চলে যান না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত যদিও বিভিন্ন দেবতাদের নামে নিবেদিত যজ্ঞের আহুতির মাধ্যমে আহার করেন, তবুও যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে আহার করার থেকে তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও ভক্তদের মুখের দ্বারা আহার করে তিনি অধিক তৃপ্তি অনুভব করেন, কারণ তিনি তখন ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, বিভিন্ন দেবতাদের নামে ভগবানকে আহার প্রদান করার জন্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রে *স্বাহা* শব্দের উচ্চারণ করা হয়, যেমন—ইন্দ্রায় স্বাহা, আদিত্যায় স্বাহা। এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় ইন্দ্র, আদিত্য ইত্যাদি দেবতাদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য, কারণ ভগবান বলেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু বা ।
তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ ॥

"আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না; যেখানে আমার ভক্তরা আমার মহিমা কীর্তন করে, আমি সেইখানে থাকি।" তা থেকে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও তাঁর ভক্তদের সঙ্গত্যাগ করেন না।

অগ্নি অবশ্যই অচেতন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের চেতন প্রতিনিধি। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজন করানো হলে, সরাসরিভাবে ভগবানকে ভোজন করানো হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার পরিবর্তে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের আহার করানো উচিত, কারণ সেই পন্থাটি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে অধিক কার্যকরী। অদ্বৈত প্রভু তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে, তিনি প্রথমে হরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করে তাঁকে প্রসাদ নিবেদন করেছিলেন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহার নিবেদন করা হয়। কিন্তু অদ্বৈত প্রভু তা নিবেদন করেছিলেন হরিদাস ঠাকুরকে, যিনি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এমন কার্য কেন করছেন, যার ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর মর্যাদা বিপর্যস্ত হতে পারে। অদ্বৈত আচার্য উত্তর দিয়েছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরকে আহার নিবেদন করার মাধ্যমে, তিনি কোটি কোটি

সর্বোত্তম ব্রাহ্মণকে ভোজন করাচ্ছেন। তিনি সেই বিষয়ে যে-কোন বিদ্বান ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের মতো একজন শুদ্ধ ভক্তকে ভোজন করিয়ে, তিনি হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা হয়, কিন্তু সেই প্রকার আহুতি যখন বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয়, তা নিশ্চয়ই অধিক ফলপ্রসূ হয়।

শ্লোক ৪২

যদ্ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি; **নিত্যম্**—শাশ্বতরূপে; **বিরজম্**—নির্মল; **সনাতনম্**—অনাদি; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মঙ্গল**—শুভ; **মৌন**—মৌন; **সংযমৈঃ**—মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে; **সমাধিনা**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে; **বিভ্রতি**—প্রকাশিত হয়; **হ**—যেভাবে তিনি তা করেছিলেন; **অর্থ**—বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **দৃষ্টয়ে**—খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে; **যত্র**—যে বিষয়ে; **ইদম্**—এই সমস্ত; **আদর্শে**—দর্পণে; **ইব**—সদৃশ; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণদের দিব্য স্থিতি শাশ্বতরূপে সুরক্ষিত হয়, কারণ সেই সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা, তপস্যা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এবং ধ্যানের দ্বারা বৈদিক নির্দেশ পালন করা হয়। এইভাবে জীবনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন স্বচ্ছ দর্পণে মুখ পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন সজীব ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার থেকেও অধিক ফলদায়ক। এখন এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ব্রাহ্মণত্ব কি এবং ব্রাহ্মণ কে। ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর ফল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের থেকেও অধিক ফলদায়ক, এই শাস্ত্রোক্তির সুযোগ নিয়ে, কলিযুগে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কিছু ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর অধিকারি না হওয়া সত্ত্বেও, কেবল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্ব দাবি করে এই ব্রাহ্মণ-ভোজনের সুযোগ

গ্রহণ করে। কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং কে তা নয়, তা নির্ণয় করার জন্য পৃথু মহারাজ এখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সঠিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। আলোক যদি না থাকে, তা হলে আগুন হওয়ার দাবি করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণকে বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সিদ্ধান্তের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। বৈদিক সিদ্ধান্ত—বেদের চরম উপলব্ধি বা বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যেভাবে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে *(জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ),* কেবলমাত্র সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে, কোন ব্যক্তি পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হন। যেই ব্রাহ্মণ পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তিনি সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, কোন অবস্থাতেই তাঁর অধঃপতন হয় না, এবং তিনি অবিলম্বে ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ব্রাহ্মণ। তাঁর স্থিতি দিব্য, কারণ তিনি বদ্ধ জীবনের চারটি ত্রুটি—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা থেকে মুক্ত। আদর্শ বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, কারণ তিনি যা কিছু বলেন তা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির শিক্ষা অনুসারেই বলেন। যেহেতু বৈষ্ণব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলেন, তাই তাঁরা যা বলেন তা এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সকলেরই উচিত সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করা, সকলেরই তাঁর ভক্ত হওয়া উচিত, তাঁকে পূজা করা উচিত এবং চরমে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। এই সমস্ত ভক্তিমূলক কার্যকলাপ দিব্য এবং তা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা থেকে মুক্ত। তাই, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত এবং যাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ভিত্তিতেই তাঁর বাণী প্রচার করেন, তাঁরা *বিরজম্,* অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, প্রকৃত ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব সর্বদা *বেদের* সিদ্ধান্ত বা পরমেশ্বর ভগবানের নিজের দেওয়া বৈদিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল আমরা পরম সত্যের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই পরম সত্যকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও চরমে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অনাদি কাল থেকেই এই জ্ঞান পূর্ণ,

এবং ব্রহ্মণ্য বা বৈষ্ণব সংস্কৃতি এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাই, শ্রদ্ধাসহকারে *বেদ* অধ্যয়ন করা উচিত। কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের জন্য তা পাঠ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে এই জ্ঞান ও তার কার্যকলাপ বিস্তারের জন্য পরমেশ্বর ভগবান ও *বেদের* বাণীতে প্রকৃত শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে তা করা উচিত।

এই শ্লোকে*মঙ্গল* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যা কিছু ভাল তা করা এবং যা ভাল নয় তা পরিত্যাগ করার নাম *মঙ্গল* । ভাল কার্য করার অর্থ হচ্ছে ভক্তির অনুকূল কার্য স্বীকার করা এবং ভক্তির প্রতিকূল কার্য বর্জন করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা চারটি পাপকার্য বর্জন করি—যথা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া ও আমিষ আহার—এবং আমরা প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ষোলমালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি, এবং ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করি। এইভাবে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অটুট রাখা যায়। নিষ্ঠাসহকারে এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করে, যদি কেউ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,* এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে পারমার্থিক জীবনে উন্নতিলাভ করবেন এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করবেন। যেহেতু বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন অথবা হৃদয়ঙ্গম করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, তাই উপরোক্ত বিধি অনুসারে যিনি বৈদিক নিয়ম পালন করেন, তিনি প্রথম থেকেই স্বচ্ছ দর্পণে যেভাবে নিজের মুখ দেখা যায়, ঠিক সেইভাবে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। তাই, সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীবাত্মা হওয়ার ফলে অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, তাঁর মধ্যে শাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত গুণগুলি থাকা কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মণ্যধর্ম আচরণ করা কর্তব্য। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারেন এবং বুঝতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ কে। ভগবদ্ভক্ত যে কিভাবে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বর্ণিত হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিত করার ফলে, ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে তাঁকে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করেন। সেটিই হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপূর্ণ অবস্থা।

শ্লোক ৪৩

তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্বগুণা ভজন্তি ॥ ৪৩ ॥

তেষাম্—তাঁদের সকলের; **অহম্**—আমি; **পাদ**—পদ; **সরোজ**—কমল; **রেণুম্**—ধূলিকণা; **আর্যাঃ**—হে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ; **বহেয়**—বহন করি; **অধি**—পর্যন্ত; **কিরীটম্**—মুকুট; **আয়ুঃ**—জীবনের শেষ পর্যন্ত; **যম্**—যা; **নিত্যদা**—সর্বদা; **বিভ্রতঃ**—বহন করে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **পাপম্**—পাপপূর্ণ কার্যকলাপ; **নশ্যতি**—নষ্ট হয়; **অমুম্**—এই সমস্ত; **সর্ব-গুণাঃ**—পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন; **ভজন্তি**—পূজা।

অনুবাদ

এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ! আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা সর্বদা আমার মুকুটে ধারণ করতে পারি। যিনি এই প্রকার ধূলিকণা তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারেন, তিনি অতি শীঘ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত বাঞ্ছিত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানে যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবদের প্রতি যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হয়। *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন, *নৈষাং মতিস্তাবদ্ উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২) । যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারা যায় না যে, পরমেশ্বর ভগবান কে, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে না জানা পর্যন্ত জীবন অপূর্ণ থাকে। বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জেনে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত বিরল। যে রাজমুকুট ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পদধূলি বহন করে না, তা রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে এক বিশাল বোঝা মাত্র। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজের মতো

বদান্য রাজা যদি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপদেশ অনুসরণ না করেন অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসরণ না করেন, তা হলে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে একটি বোঝাস্বরূপ, কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের কোন রকম মঙ্গলসাধন করতে পারেন না। পৃথু মহারাজ হচ্ছেন একজন আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৪

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাং চ
জনার্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥ ৪৪ ॥

গুণ-অয়নম্—যিনি সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জন করেছেন; **শীল-ধনম্**—সৎ আচরণ যাঁর সম্পদ; **কৃত-জ্ঞম্**—কৃতজ্ঞ; **বৃদ্ধ-আশ্রয়ম্**—যিনি জ্ঞানীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন; **সং বৃণতে**—প্রাপ্ত হন; **অনু**—নিশ্চিতভাবে; **সম্পদঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্য; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হন; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণশ্রেণী; **গবাম্**—গাভী; **চ**—এবং; **জনার্দনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স**—সহ; **অনুচরঃ**—তাঁর ভক্তগণ সহ; **চ**—এবং; **মহ্যম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন—যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তাঁর সৎ আচরণ, যিনি কৃতজ্ঞ এবং যিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাগত—তিনি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন। আমি তাই বাসনা করি যে, পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদেরা যেন গাভীসহ আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ—এই প্রার্থনার দ্বারা ভগবান পূজিত হন। তার ফলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের শ্রদ্ধা করেন এবং রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যেখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রয়েছে, সেখানেই গোপালন ও গোরক্ষা হয়। যেই সমাজে অথবা সভ্যতায় ব্রাহ্মণ নেই অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি নেই, সেখানে মানব-সভ্যতার সর্বনাশ সাধন করে, গাভীদের সাধারণ পশু বলে মনে করে হত্যা করা হয়। পৃথু মহারাজ যে এখানে *গবাম্* শব্দটি উল্লেখ করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান

সর্বদাই গাভী ও ভক্তদের সঙ্গে থাকেন। ছবিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব সময় গাভী, গোপবালক ও গোপ-বালিকাদের সঙ্গে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই একলা থাকতে পারেন না। তাই পৃথু মহারাজ *সানুচরশ্চ* শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর অনুগামী ও ভক্তদের সঙ্গে থাকেন।

দেবতাদের সমস্ত গুণাবলী ভগবদ্ভক্ত অর্জন করেন; তিনি *গুণায়নম্*, সমস্ত সদ্‌গুণের আধার। তাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে সদ্‌গুণাবলী, এবং তিনি কৃতজ্ঞ। ভগবানের কৃপার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের একটি গুণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সকলেরই কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত, কারণ তিনি সমস্ত জীবদের পালন করছেন এবং তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। বেদে (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—এক পরমেশ্বর ভগবান জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। তাই যে-সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ, তারা নিশ্চিতভাবে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত।

এই শ্লোকে *বৃদ্ধাশ্রয়ম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃদ্ধ শব্দটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝায়। বৃদ্ধ দুই প্রকার, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। যিনি জ্ঞানবান, তিনিই প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ (জ্ঞানবৃদ্ধ); কেবল বয়সে প্রবীণ হলেই বৃদ্ধ হয় না। *বৃদ্ধাশ্রয়ম্*, যিনি জ্ঞানবান গুরুজনের আশ্রয় করেন, তিনি ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জন করেন এবং তিনি সৎ আচরণ শিক্ষালাভ করতে পারেন। কেউ যখন প্রকৃত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের করুণা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হন এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি তখন সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। সেই প্রকার ব্যক্তিই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব। পৃথু মহারাজ তাই পার্ষদ, ভক্ত, বৈষ্ণব ও গাভীসহ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ৪৫

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ ।
তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলার সময়; **নৃ-পতিম্**—রাজা; **পিতৃ**—পিতৃলোকের অধিবাসীগণ; **দেব**—দেবতাগণ;

দ্বি-জাতয়ঃ—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব) দ্বিজগণ; **তুষ্টুবুঃ**—সন্তুষ্ট; **হৃষ্ট-মনসঃ**—অন্তরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **সাধু-বাদেন**—প্রশংসা বাক্যের দ্বারা; **সাধবঃ**—উপস্থিত সমস্ত সাধু ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—পৃথু মহারাজের সেই সুন্দর বাণী শ্রবণ করে, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন সভায় কেউ যখন খুব সুন্দরভাবে ভাষণ দেন, তখন শ্রোতারা সাধু-সাধু শব্দে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাকে বলা হয় সাধুবাদ। সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত মহর্ষি, পিতৃ ও দেবতারা পৃথু মহারাজের ভাষণ শ্রবণ করে সাধু-সাধু বলে তাঁদের শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁরা সকলে পৃথু মহারাজের সৎ উদ্দেশ্য সমর্থন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

পুত্রেণ জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ ।
ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্বেণোঽত্যতরত্তমঃ ॥ ৪৬ ॥

পুত্রেণ—পুত্রের দ্বারা; **জয়তে**—জয়ী হন; **লোকান্**—সমস্ত স্বর্গলোক; **ইতি**—এইভাবে; **সত্যবতী**—সত্য হয়; **শ্রুতিঃ**—বেদ; **ব্রহ্ম-দণ্ড**—ব্রাহ্মণের অভিশাপের দ্বারা; **হতঃ**—নিহত; **পাপঃ**—সব চাইতে পাপী; **যৎ**—যেমন; **বেণঃ**—পৃথু মহারাজের পিতা; **অতি**—অত্যন্ত; **অতরৎ**—উদ্ধার লাভ করেছিলেন; **তমঃ**—নরকের অন্ধকার থেকে।

অনুবাদ

তাঁরা সকলে ঘোষণা করেছিলেন যে, পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতা স্বর্গলোক-সমূহ জয় করতে পারেন,—এই হিতবাক্য সার্থক হয়েছে; যেহেতু ব্রহ্মশাপের ফলে নিহত পাপী বেণও তার পুত্র মহারাজ পৃথুর দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক থেকে নিস্তার পেল।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে পুৎ নামক একটি নরক রয়েছে, এবং সেই নরক থেকে যে উদ্ধার করে তাকে বলা হয় পুত্র। তাই বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্রলাভ করা, যে পিতাকে পুৎ নামক নরকে পতিত হলেও উদ্ধার করতে পারবে। পৃথু মহারাজের পিতা বেণ ছিল অত্যন্ত পাপী এবং তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তার মৃত্যু হয়েছিল। এখন, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত মহাত্মা, ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণ করে নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলেন যে, বেদের বাণী পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপযুক্ত পুত্রসন্তান লাভ করা, যে তার পিতাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশ থেকে উদ্ধার করতে পারবে। বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়, পিতার উদ্ধারকারী সুযোগ্য পুত্রসন্তান লাভ করা। কিন্তু পুত্র যদি অযোগ্য অসুর হয়ে যায়, তা হলে সে পিতাকে কিভাবে নরক থেকে উদ্ধার করবে? তাই পিতার কর্তব্য নিজে বৈষ্ণব হয়ে, পুত্রদেরও বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা দেওয়া; তা হলে পিতা যদি ঘটনাক্রমে পরবর্তী জীবনে নরকে পতিতও হয়, তার সুযোগ্য পুত্র তাকে উদ্ধার করতে পারবে, ঠিক যেমন পৃথু মহারাজ তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ ।
বিবিক্ষুরত্যগাৎসূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥ ৪৭ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা; **চ**—ও; **অপি**—পুনরায়; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নিন্দয়া**—নিন্দা করার ফলে; **তমঃ**—নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **অত্যগাৎ**—উদ্ধার লাভ করেছিল; **সূনোঃ**—তার পুত্রের; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অনুভাবতঃ**—প্রভাবে।

অনুবাদ

তেমনই, হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পাপে নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তার মহান পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রভাবে, সেও উদ্ধার লাভ করে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর গভীর ভক্তি ও সহনশীলতার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই প্রকার বরগ্রহণ ঐকান্তিক ভক্তের শোভা পায় না। কোন পুরস্কার লাভের আশায় ভগবানের সেবা করাকে প্রহ্লাদ মহারাজ এক ধরনের ব্যবসা বলে নিন্দা করেছেন। যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন বৈষ্ণব, তাই তিনি নিজের স্বার্থে কোন বর প্রার্থনা করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার প্রতি গভীর অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। যদিও তাঁর পিতা তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, এবং ভগবান তাকে হত্যা না করলে, প্রহ্লাদকে সে হত্যা করত, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজ তার মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করেছিলেন, এবং হিরণ্যকশিপু নরকের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে উদ্ধার লাভ করে তার পুত্রের কৃপায় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আদর্শ দৃষ্টান্ত, এই জড় জগতে নিরন্তর নারকীয় যন্ত্রণাভোগ করছে যে-সমস্ত পাপী, তাদের প্রতি যিনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই *পর-দুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধিঃ* বলা হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভগবানের সমস্ত ভক্তরা পাপী জীবদের উদ্ধার করার জন্য এই জড় জগতে আসেন। তাঁরা সহিষ্ণুতা সহকারে সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করেন, কারণ সেটি জড় জগতের নারকীয় পরিবেশ থেকে পাপীদের উদ্ধারকারী বৈষ্ণবের আর একটি গুণ। তাই বৈষ্ণবদের বন্দনা করে বলা হয়—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈষ্ণবদের প্রধান ভাবনা হচ্ছে কিভাবে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৪৮

বীরবর্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃসঞ্জীব শাশ্বতীঃ ।
যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্বলোকৈকভর্তরি ॥ ৪৮ ॥

বীর-বর্য—সর্বশ্রেষ্ঠ বীর; **পিতঃ**—পিতা; **পৃথ্ব্যাঃ**—পৃথিবীর; **সমাঃ**—সমান আয়ু; **সঞ্জীব**—জীবিত থাকুন; **শাশ্বতীঃ**—চিরকাল; **যস্য**—যাঁর; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **অচ্যুতে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **সর্ব**—সমস্ত; **লোক**—লোক; **এক**—এক; **ভর্তরি**—পালক।

অনুবাদ

সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীর পিতা! আপনি দীর্ঘায়ু হোন, কারণ আপনি সমগ্র জগতের পতি অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ।

তাৎপর্য

সভায় উপস্থিত সাধুরা পৃথু মহারাজকে দীর্ঘজীবন লাভ করার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। যদিও মানুষের আয়ু সীমিত, তবুও কেউ যদি সৌভাগ্যবশত ভগবানের ভক্ত হন, তা হলে তিনি জীবনের জন্য নির্দিষ্ট স্থিতিকাল অতিক্রম করেন; কখনও কখনও যোগীরা অবশ্য দেহত্যাগ করেন তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে, জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নয়। ভক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবানের প্রতি অবিচলিত ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি চিরকাল জীবত থাকেন। বলা হয় যে, *কীর্তির্যস্য স জীবতি*—'যিনি সৎ কীর্তি রেখে যান, তিনি চিরকাল জীবিত থাকেন।' বিশেষ করে যিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে চিরকাল জীবিত থাকেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনা হয়েছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?" রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছিলেন, "কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।" কারণ ভক্ত কেবল নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকেই বাস করেন না, এই জড় জগতেও তিনি তাঁর খ্যাতির দ্বারা চিরকাল জীবিত থাকেন।

শ্লোক ৪৯

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্তে
ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ ।
য উত্তমশ্লোকতমস্য বিষ্ণো-
র্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ॥ ৪৯ ॥

অহো—আহা; **বয়ম্**—আমরা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্য**—আজ; **পবিত্র-কীর্তে**—হে পরম পবিত্র; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নাথেন**—ভগবানের দ্বারা; **মুকুন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **নাথাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রজা হয়ে; **যে**—যিনি; **উত্তম-শ্লোক-তমস্য**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা যাঁর প্রশংসা হয়, সেই ভগবানের;

বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুর; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ব্রাহ্মণদের আরাধ্য ভগবান; **কথাম্**—বাণী; **ব্যনক্তি**—ব্যক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রোতারা বললেন, হে মহারাজ পৃথু! আপনার কীর্তি পরম পবিত্র, কারণ ব্রাহ্মণদের প্রভু, পবিত্র কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আপনি প্রচার করছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনাকে আমাদের প্রভুরূপে প্রাপ্ত হয়েছি, এবং তাই আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে বাস করছি।

তাৎপর্য

প্রজারা ঘোষণা করেছিলেন যে, মহারাজ পৃথুর সংরক্ষণে থেকে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা যেন পালিত হচ্ছিলেন। এই উপলব্ধিটি হচ্ছে জড় জগতে অবিচলিত সমাজ-ব্যবস্থার যথার্থ স্থিতি। যেহেতু বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালক ও নায়ক, তাই রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হওয়া। তা হলে তিনি ভগবানেরই মতো সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করতে পারেন। রাজা অথবা সমাজের নেতারা কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হতে পারেন, তাও এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু পৃথু মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের পরমেশ্বরত্ব ও মহিমা প্রচার করছিলেন, তাই তিনি ছিলেন ভগবানের উপযুক্ত প্রতিনিধি। এই প্রকার রাজা অথবা নেতার অধীনে থাকাই হচ্ছে মানব-সমাজের আদর্শ স্থিতি। এই প্রকার রাজা বা নেতার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ও গাভীদের সুরক্ষা প্রদান করা।

শ্লোক ৫০

নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্ ।
প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ইদম্**—এই; **নাথ**—হে প্রভু; **তব**—আপনার; **আজীব্য**—উপার্জনের উৎস; **অনুশাসনম্**—শাসন-ব্যবস্থা; **প্রজা**—প্রজাদের; **অনুরাগঃ**—স্নেহ; **মহতাম্**—মহতের; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **করুণ**—দয়ালু; **আত্মনাম্**—জীবদের।

অনুবাদ

হে প্রভু! প্রজাশাসন করাই আপনার ধর্ম। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তা কোন আশ্চর্যজনক কার্য নয়, কারণ আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনে যত্নবান। সেটিই আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের পালন করা এবং তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা। বৈদিক সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়ও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ করা এবং তাই তাঁদের শিষ্যদের থেকে তাঁরা দান গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু রাজার কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে প্রজাদের উন্নতি-সাধনের জন্য তাদের সুরক্ষা প্রদান করা, এবং তাই তিনি তাদের উপর কর ধার্য করতে পারেন; বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র সমাজের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং তা থেকে স্বল্প লাভ করা; কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যদের মতো স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না বলে, তারা সমাজের উচ্চতর বর্ণের সেবা করে এবং তাঁরা তাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন।

উপযুক্ত রাজা অথবা রাজনৈতিক নেতার লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁদের কর্তব্য জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়া এবং তাদের মুখ্য হিতসাধনে যত্নবান হওয়া এবং সেটি হচ্ছে ভগবানের উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়া। মহাত্মারা স্বভাবতই অন্যের হিতসাধনে আগ্রহী, এবং বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন বিশেষভাবে দয়ালু। তাই আমরা বৈষ্ণব নায়কদের প্রণতি নিবেদন করে বলি—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈষ্ণব নেতাই কেবল মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন *(বাঞ্ছাকল্পতরু)*, এবং তিনি অত্যন্ত কৃপালু কারণ তিনি মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করেন। তিনি পতিতপাবন, কারণ রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতারা যদি ভগবদ্বাণীর প্রচার-কার্যের নেতা বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে বৈশ্যেরাও বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, এবং শূদ্রেরা তাঁদের সেবা করবেন। তার ফলে জীবনের পরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সমগ্র সমাজ প্রগতিশীল এক আদর্শ মানব-সমাজে পরিণত হবে।

শ্লোক ৫১

অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো ।
ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ ॥ ৫১ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **তমসঃ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে; **পারঃ**—অপর পারে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উপাসাদিতঃ**—বর্ধিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **ভ্রাম্যতাম্**—ভ্রাম্যমাণ; **নষ্ট-দৃষ্টীনাম্**—যারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়েছে; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের ফলে; **দৈব-সংজ্ঞিতৈঃ**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত।

অনুবাদ

নাগরিকেরা বললেন—আজ আপনি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে ভবসাগর অতিক্রম করা যায়। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম ও দৈবের ব্যবস্থাপনায় আমরা সকাম কর্মের জালে আটকে পড়েছি এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি; তার ফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কর্মভির্দৈব-সংজ্ঞিতৈঃ* পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কর্মের গুণ অনুসারে, আমরা জড়া প্রকৃতির গুণের সম্পর্কে আসি, এবং দৈবের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শরীরের মাধ্যমে সেই সমস্ত কর্মের ফলভোগ করার সুযোগ পাই। এইভাবে জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন যোনিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনও তারা উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়; এইভাবে আমরা সকলে অনাদিকাল ধরে ভ্রমণ করছি। শ্রীগুরুদেব ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জানতে পারি, এবং তার ফলে আমাদের জীবনের প্রগতি শুরু হয়। এখানে পৃথু মহারাজের প্রজারা স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা পূর্ণরূপে অনুভব করতে পেরেছেন যে, পৃথু মহারাজের উপদেশের ফলে তাঁরা লাভবান হয়েছেন।

শ্লোক ৫২

নমো বিবৃদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে ।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্তীদং স্বতেজসা ॥ ৫২ ॥

নমঃ—প্রণাম; **বিবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উন্নত; **সত্ত্বায়**—অস্তিত্বে; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **মহীয়সে**—যিনি এইভাবে মহিমামণ্ডিত; **যঃ**—যিনি; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি; **ক্ষত্রম্**—প্রশাসনিক কর্তব্য; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বিভর্তি**—পালন করে; **ইদম্**—এই; **স্ব-তেজসা**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; তাই আপনি পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি। আপনি আপনার স্বীয় প্রভাবের দ্বারা মহিমান্বিত, এবং এইভাবে আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করার দ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করছেন, এবং ক্ষত্রিয়রূপে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে আপনি সকলকে রক্ষা করছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ব্যতীত এবং রাষ্ট্রের উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যতীত, কোন সমাজ-ব্যবস্থারই মান যথাযথভাবে বজায় রাখা সম্ভব নয়। পৃথু মহারাজের প্রজারা এই শ্লোকে তা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর রাজ্যে এক অপূর্ব সুন্দর অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *বিবৃদ্ধ-সত্ত্বায়* শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে—যথা সত্ত্ব, রজ ও তম। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত জীবনের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার আর কোন পন্থা নেই; যে-কথা এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং তাঁদের শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী নিয়মিতভাবে শ্রবণ করার ফলে, নিকৃষ্টতম জীবন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

মানুষ যখন শ্রবণ ও কীর্তনের প্রারম্ভিক অনুশীলনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করতে সহায়তা করেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/২৭) এইভাবে ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে মানুষ রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। রজ ও তমোগুণের প্রভাবের ফলে, কাম ও লোভের উদয় হয়। কিন্তু মানুষ যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি কাম ও লোভ থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনের

যে-কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই প্রকার মানসিকতা ইঙ্গিত করে যে, তিনি সত্ত্বগুণের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই সত্ত্বগুণের স্তরও অতিক্রম করে, *বিবৃদ্ধ-সত্ত্ব* বা বিশুদ্ধ সত্ত্বে উন্নীত হতে হয়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত হওয়া যায়। তাই পৃথু মহারাজকে এখানে *বিবৃদ্ধ-সত্ত্ব* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। চিন্ময় স্তরে অবস্থিত শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজ মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্তরে অবতরণ করেছেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর স্বীয় প্রভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎ রক্ষা করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজা, একজন ক্ষত্রিয়, কিন্তু একজন বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণও। ব্রাহ্মণরূপে তিনি প্রজাদের যথাযথভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং একজন ক্ষত্রিয়রূপে তিনি তাঁদের সকলকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন। পৃথু মহারাজের প্রজারা একজন আদর্শ রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে সুরক্ষিত ছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের উপদেশ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।